হরি বিরঞ্চি দুহু জন বৈসল হরকে দেল মোয়ঁ গোরি।
নারদ তুম্বুর মঙ্গল গাবথি আওর কতন নারি।
কৌতুকে কোবর কৌসলে কামিনি সবে সবে দেঅ গারি॥
ভন বিদ্যাপতি গৌরি পরীণয় কৌতুক কহএ ন জাএ।
সাপ ফুফুকারে নারি পড়াইলি বসন ঠাম নড়াএ॥—৭৮২ সং

'যখন শঙ্কর গৌরীকে করে ধরিয়া আনিলেন মণ্ডপের মাঝে, যেন শরতের সম্পূর্ণ শশধর সন্ধ্যাকালে উদয় হইল। চৌদ্দ ভুবনের শোভাকারী শিব—গৌরী রাজকুমারী; দেখিয়া মন্দাকিনী হরষিত হইলেন—যেন জম্ভারি (ইন্দ্র) আসিলেন। হেমন্তের (হিমালয়ের) শরীর পুলকে পূরিল,—সফল আমার জন্ম; হরি বিরিঞ্চি দুইজনে বসিলেন, হরকে দিলাম আমি গৌরী। নারদ তম্বুরায় মঙ্গল গান, আরও কত নারী (মঙ্গল গায়); কৌতুকে বাসরঘরে কামিনীরা কৌশলে সকলে সকলকে (পরস্পরে) গালি দেয়। বলিতেছে বিদ্যাপতি গৌরী-পরিণয়, কহা যায় না; সাপের ফোঁসফোঁসানিতে নারীরা পলাইল, বসন সব ফেলিয়া।'

বিবাহের পরে শিব শ্বশুরবাড়িতেই গৌরীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, সৃষ্টিছাড়া তাঁহার সব কাণ্ডকারখানা। নৃত্যে নৃত্যে মস্তকের গঙ্গাজলে নীচের নৃত্যভূমি গেল ভিজিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া হর পড়িয়া যান পিছলাইয়া; তুলিয়া ধরিতে গৌরী শীঘ্র আগাইয়া যান, করকঙ্কণ-ফণী ওঠে ফোঁস করিয়া।

গঙ্গাজলে সিচ় রঙ্গভূমি। পিছরি খসল হর ঘুমি ঘুমি॥
অবলম্বনে গোরী তোরএ জাএ। করকঙ্কণ ফণি উঠ ফাফএ॥—৭৮৩ সং

ইহার পরে সম্ভোগ বর্ণনা। সংস্কৃত কবিগণও এ-ক্ষেত্রে যেমন নিষেধ মানেন নাই, বিদ্যাপতিও মানেন নাই। তবে হর-গৌরীর ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি অনেক সংযত। 'অঞ্জলি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন, তাহা লইয়া শম্ভু আরাধনে চলিলেন ভবানী। জাতি যূথী আর বেলপাতা তুলিলাম আমি,—উঠ হে মহাদেব, প্রভাত হইয়া গেল। যখন হর (পার্বতীকে) দেখিলেন তিন নয়নে, সেই অবসরে মদনে পীড়িতা হইলেন গৌরী। করতল কাঁপিতে লাগিল—ছড়াইয়া পড়িল কুসুম, বিপুলপুলক তনু—বসন দিয়া ঝাঁপিলেন। ভাল হর, ভাল গৌরী, ভাল ব্যবহার, জপ-তপ দূরে গেল মদন-বিকারে!'

অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনী।
সম্ভু অরাধএ চললি ভবানী॥
জাহি জুহি তোড়ল মোয়ঁ আওর বেলপাতে।
উঠিঅ মহাদেব ভএ গেল পরাতে॥
জখনে হেরলি হরে তিনিহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরি পিড়লি মদনে॥

করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িআউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝাঁপউ॥
ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দুর গেল মদন বিকারে॥

কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গেল ঝগড়াঝাঁটি রাগারাগি। গুরুরোষে ঘর ছাড়িয়া কোথায় গেলেন হর নিখোঁজ হইয়া—গৌরী পথে বাহির হইলেন সন্ধানে। এই জাতীয় কয়েকটি পদ আমরা প্রসঙ্গান্তরে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।[৩]

এত ঝগড়াঝাঁটি বাদবিসম্বাদের মধ্যেও বিদ্যাপতি পুত্র বিবাহের একটি চমৎকার ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কার্তিক বড় হইয়াছে, বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহা লইয়াই হর-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা।

আনে বোলব কুল অথিকহু হীন।
তেঁহি কুমার অছল এত দীন॥
তোহর হমর শিব বএস ভেল আএ।
আবহু ন চিন্তহ বিআহ উপাএ॥
ভল শিব ভল শিব ভল বেবহার।
চিতা চিন্তা নহি বেটা কুমার॥
হসি হর বোলথি সুনহ ভবানী।
জনিতহু ককে দেবি হোহ অগেয়ানী॥
দেস বুলিএ বুলি খোজওঁ কুমারী।
ছুহ্কি সরিস মোহি ন মিলএ নারী॥
এত শুনি কাতিক মনে ভেল লাজ।
হম ন হে মাএ বিআহক কাজ॥
নহি বিআহব রহব কুমার।
ন কর কন্দল অমা সপথ হমার॥

'অন্যে বলিবে কুল হীন ছিল, তাই (কার্তিক) এতদিন কুমার (অবিবাহিত) ছিল। তোমার আমার হে শিব, বয়স হইল, এখনও বিবাহের উপায় চিন্তা করিতেছ না। ভাল শিব, ভাল শিব, ভাল তোমার ব্যবহার; তোমার চিত্তে চিন্তা নাই, ছেলে রইল কুমার (অবিবাহিত)। হাসিয়া হর বলিলেন, শোন ওগো ভবানি,—জানিয়া শুনিয়াও কি করিয়া দেবি হও অজ্ঞানী? দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরি, খুঁজি কুমারী, উহার (কার্তিকের) উপযুক্ত মেয়ে আমার মিলিতেছে না। ইহা শুনিয়া কার্তিকের মনে হইল লাজ—হে মা, আমার বিবাহে কাজ নাই। বিবাহ করিব না, কুমার থাকিব; তোমরা দুজনে কোন্দল করিও না, আমার শপথ।'

---

৩. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬৫ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পুত্রের কথায় পিতা-মাতার কোন্দল অন্তত তৎকালের জন্য থামিয়া গেল।

বিদ্যাপতি রচিত এই হর-পার্বতী সম্বন্ধীয় গানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে বিচার করিলে চলিবে না ; পূর্বেই যে আমরা মিথিলায় শাক্তধর্ম ও সংস্কৃতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবের কথা বলিয়া আসিয়াছি বিদ্যাপতির গানগুলিকে তাহার সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হইবে, কারণ এইরূপ হর-পার্বতী সম্বন্ধীয় গান বা শুধু দেবী-সম্বন্ধীয় গান মিথিলায় পরবর্তী কালে নানা ভাবে পাওয়া যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, বিদ্যাপতি মিথিলার সিংহ-রাজবংশীয় ধীর সিংহের (ভৈরব সিংহ ?) আদেশে বা উৎসাহে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' নামে সকল পুরাণ-তন্ত্রস্মৃতি অবলম্বন করিয়া একখানি দুর্গাপূজাবিধি প্রণয়ন করেন। ইহা হইতে মনে হয় বিদ্যাপতির পূর্ব হইতে মিথিলায় মৃন্ময়-দুর্গাপূজার একটা জনপ্রিয়তা ছিল। মহামহোপাধ্যায় মুকুন্দ ঝা বক্সী মহাশয় তাঁহার 'মিথিলাভাষাময় ইতিহাস' গ্রন্থে পণ্ডিত আঁখী ঝা নামক তান্ত্রিক শক্তি-উপাসকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মিথিলার কর্ণাট রাজগণের গুরু শক্তি-উপাসক সিদ্ধ কামেশ্বরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান খণ্ডবলা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠাকুর ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (?) তাঁহার রাজ্যত্যাগের পরে গঙ্গা ও তারা সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। মধ্যযুগের সংগীতশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ 'রাগ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থের রচয়িতা লোচন শক্তিকে অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

> জয় জয় জয় নত সতত সিবঙ্করি পরিহিত নরসিরমালে।
> লম্বিত রসনি দসন অতি ভীষন বসন মিলল বঘ ছালে॥
> চৌদিসঁ মান্থস মাঁস মুদিত অতি ফেরু ফুকর কতরাসে।
> মনিময় বিবিধ বিভূষনে মণ্ডিত বেদি বিদিত তুঅ বাসে॥
> বিমল বালরবি মণ্ডল সন তুঅ তীন নয়ন পরগাসে।
> অসুররুহির মদিরামদ মাতলি বদন অমিয় সম হাসে॥
> তুঅ অনুরূপ সরূপ বুঝিঅ নহি তৈঅও তোহর গুন গাউ।
> এঁকহি তুঅ পদবন্ধ করিঅ দেখি নিঞগনে 'লোচন' লাউ॥[৪]

এই গানে বর্ণিতা দেবী হইলেন কালী। আমরা বাঙলা শাক্ত পদাবলীতে কালীর যে-সকল বর্ণনা দেখিয়া আসিয়াছি এই বর্ণনার তাহার সহিত বেশ মিল আছে।

নেপালে যাঁহারা মৈথিলী সংগীত রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভূপতীন্দ্র মল্লের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচিত মৈথিলী সংগীতের কথা ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ই প্রথম আবিষ্কার ও উল্লেখ করেন। নেপাল দরবার পুস্তকাগারে রক্ষিত ভূপতীন্দ্র মল্ল কর্তৃক রচিত 'ভাষা-সংগীত' গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক গান আছে, তাহার অর্ধেকের বেশি শক্তি সম্বন্ধে। তাঁহার মতে শক্তি স্বতন্ত্রা এবং পরমতত্ত্ব—অন্য দেবগণ তাঁহার সেবক মাত্র।—

---

৪. রাজ-তরঙ্গিণী, পণ্ডিত বলদেব মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৯৯-১০০।

জয় নগনন্দিনি, বাহনি মৃগরাজ।
অনুখন সেবয় বিধি-সুররাজ॥

তাঁহার একটি গানে প্রপত্তির ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।--

হে দেবি শরণ রাখ ভবানি।
মন বচ করম করও মান কিছু
সে সবে ত আপদ জানি॥
হমে অতি দিনহীন তুঅ সেবা
রাখ হরি যজন ঠানি।
অভি(বি)নয় মোর অপরাধ সম্ভব
মন জনু রাখহ আনি॥
অওর-ইতর জন জগ জত সে সবে
গুণ রসমক সে বাণি।
তুঅ পদকমল ভমোর মোর মানস
জনমে জনমে এহো ভানি॥[৫]

নেপালের রাজা জগৎপ্রকাশ মল্ল গৌরী ও ভবানী সম্বন্ধে অনেক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন; রাজা রণজিৎ মল্লও শাক্ত সংগীত রচনা করিয়াছেন।

হর-গৌরীকে অবলম্বন করিয়া নেপালে এবং মিথিলায় মৈথিলী ভাষায় অনেক নাটক রচিত হইয়াছে।[৬] নেপালের জগজ্জ্যোতির্মল্ল 'হর-গৌরী-বিবাহ' (১৬২৯ খ্রীঃ অঃ) নামে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নেপালের জিতামিত্র মল্ল 'ভারত-নাটকম্' রচনা করিয়াছেন, ইহার বিষয়বস্তুও হর-গৌরী। বংশমণি ঝা 'গীত-দিগম্বর' (১৬৫৫খ্রীঃ অঃ) নামে যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহাতে গৌরী কি করিয়া শিবকে স্বামী লাভ করিলেন তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। এই নাটকের পুঁথি নেপালের দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। লাল কবি 'গৌরী-স্বয়ম্বর' নামে নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকখানি অনেকটা একাঙ্ক নাটকের ন্যায়। নাটকের মধ্যে বহু সুন্দর সুন্দর মৈথিলী গান আছে। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' তপস্যারত গৌরীকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বটুবেশধারী শিবের আগমন ও গৌরীর সহিত শিব-সম্বন্ধে তাঁহার তর্ক—ইহাই এখানে মুখ্য বিষয়। শিবনিন্দা শুনিয়া গৌরী বটুব্রাহ্মণকে কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করিলে শিব স্বমূর্তি ধারণ করিয়া গৌরীকে বলিলেন—

হে সখি সবহু সুনৈ ছিঅ গারি। ককরহু তহ নহি হোইছনে বারি॥
অসত বচন কহনে অনুতাপে। বড় জন নিন্দা সুননহু পাপে॥

৫. অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম্. এ.-র সংগ্রহ হইতে।
৬. এ সম্বন্ধে তথ্যগুলি অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

হিনকা কহিঅমু জাথি ফিরি গামে। নহি তোঁ হমহি তেজই ছিঅ ঠামে॥
ঈ করি চরণ উঠাওল জানি : ধয়ল জটিল কর তরলি ভবানি॥
কহলহ্নি শংকর হমরে নাম। করব বিবাহ জায়ব নিজ ধাম॥
এত বা সুনি গৌরী হরসিত ভেলি। তহি খন তপ তেজি মন্দির গেলি॥
সুকবি লাল নে থিব রহ কাল। সুদিন সদাশিব ভেলাহ দয়াল॥

'হে সখি শুনিয়াছি সব গালি, কাহারও দ্বারাই এ নিবারিত হইতেছে না। অসৎ বচন বলিলে অনুতাপই হয়; বড় জনের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। ইঁহাকে বল গ্রামে ফিরিয়া যাইতে : না হইলে আমিই এই স্থান ত্যাগ করিতেছি। এই কহিয়াই চরণ উঠাইলেন; জটাধারী চঞ্চলা ভবানীর হাত ধরিলেন। কহিলেন, আমারই নাম শঙ্কর, বিবাহ করিয়া নিজের ধামে যাইব। এত শুনিয়া গৌরী হরষিত হইলেন, তখনই তপস্যা ত্যাগ করিয়া মন্দিরে গেলেন। সুকবি লাল বলিতেছেন, কাল স্থির থাকে না, সুদিনে সদাশিব দয়াল হইলেন।'

'গৌরী-পরিণয়' নামে শিবদত্ত রচিত একখানি নাটক আছে। এখানে দেখি, গৌরী নিজ-কাননে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন হঠাৎ শিবকে দেখিতে পাইলেন। প্রথম দর্শনেই গৌরীর প্রাণে প্রেম সঞ্চার হইল, গৌরীর আর ঘরে ফিরিয়া যাইবারও ইচ্ছা রহিল না—

আহে সখি বাঢ়ল শিবক সিনেহ, গেহ নহি জাএব হে।

কুমারী নারীর প্রেমনিবেদন লইয়া এখানে চমৎকার কতকগুলি গান দেখা যায়। এই গানগুলি স্থানে স্থানে রাধার প্রেমনিবেদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কান্হারাম দাসের 'গৌরী-স্বয়ম্বর-নাটক' আছে। এই নাটকের সংগীতগুলি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সম্বলিত কীর্তন-সংগীতের অনুরূপ রীতিতে লিখিত। এখানে দেখা যায়, দয়িত শিবের জন্য গৌরী সব রকমের কৃচ্ছ্রতা সাধন করিতেছেন। একস্থানে দেখি শিবপূজার জন্য পুষ্পচয়নের নিমিত্ত গৌরী গহন বনে ফুলের অন্বেষণ করিতেছেন—

ভমি ভমি বিপিন তোড়ল দল ফুল। অনেক কুসুম দল ছোড়ি অড়হুল॥
বেলি চমেলি কুন্দ নেবার। তোড়ল শ্রীদল তাকি অংগার॥
ধূপ দীপ নৈবেদ কর তুল। পূজিঅ সদাশিব হোথি অনুকূল॥
করব কঠিন ব্রত গৌরি ত্রিকাল। বরিঅ আব হর দীন দয়াল॥

আধুনিক কালে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র মহাশয়ও মুখ্যতঃ কুমারসম্ভবের বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'রাজ-রাজেশ্বরী-নাটক' রচনা করিয়াছেন। কবি হর্ষনাথ ঝার 'মাধবানন্দ নাটকম্'-এও প্রথম গীতিটি হইল দেবী সম্বন্ধে।—

জয় জগজননী জয় জগজননী দেহু সুমতি মৃগপতি গমনী।
সরসিরুহাসন বিপদবিনাশনকারিণি মধুকৈটভদমনী॥...

তুঅ গুণ নিগম অগম চতুরানন কহি ন সকত কত সহস্রফণী।
অমরনিশাচরদমুজমনুজশিরচিকুরকলিতজিতরকতমনী॥
তুঅপদযুগল সরোরুহ মধুকর হর্ষনাথ কবি সরস ভনী॥[৭]

হর্ষনাথ ঝার তারা সম্বন্ধে একটি গান আছে, তাহার ছন্দ ও ভাষা উভয়ই বৈষ্ণব কবিতার অনুরূপ। যেমন—

নবল জলদ মঞ্জু ভাস,
জ্বলিত প্রেত ভূমিবাস
মুণ্ডমাল অতি বিলাস বিপদহারিণী।
তীন নয়ন অরুণ বরণ,
বিশ্বব্যাপি সলিল সরন,
ললিত ধবল কমল যুগল চরণধারিণী॥ ইত্যাদি।[৮]

উপরি-উল্লিখিত নাটকগুলি ব্যতীত মৈথিলীতে হর-গৌরী বিষয়ে বা শুধু দেবী-বিষয়ে আরও অনেক কাব্য কবিতা ও গীত রচিত হইয়াছে। লাল দাস 'সাঙ্গ-দুর্গা-প্রকাশিকা' নামে সংস্কৃত দুর্গা-সপ্তশতীর (চণ্ডীর) একটি মৈথিলী অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি 'শম্ভু-বিনোদ' ও 'গণেশ-খণ্ড' নামেও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গুণবন্তলাল দাস ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকে অনুসরণ করিয়া 'গৌরী-পরিণয়-প্রবন্ধ' রচনা করেন। ঋদ্ধিনাথ ঝা রচিত 'সতী-বিভূতি'ও উল্লেখযোগ্য। গণেশ্বর ঝা রচনা করিয়াছেন 'দেবী-গীতা'। আধুনিক মৈথিলী কবি চন্দা ঝার 'গীত-সপ্তশতী'তে ও 'সঙ্গীত-সুধা'তে[৯] হর-গৌরী সম্বন্ধে অনেক গান আছে। চন্দা ঝার 'মহেশ-বাণী-সংগ্রহ'ও শিব-শক্তি লইয়া রচিত গীত-সমষ্টি। তাঁহার 'চন্দ্র-পদ্যাবলী'তেও[১০] শিব-শক্তি সম্বন্ধে গান আছে। ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা কর্তৃক সম্পাদিত 'গণনাথ-বিন্ধ্যনাথ-পদাবলী'তে[১১] শক্তি বিষয়ে বিবিধ সংগীত সংগৃহীত হইয়াছে, কতকগুলি প্রার্থনার গান, কতকগুলি শক্তিতত্ত্বের গান। এগুলি নবরাত্র দুর্গা-পূজা উপলক্ষ্যে গীত হইবার জন্যই রচিত।

শক্তিবিষয়ক লিখিত কাব্য বা গীত ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগে লিখিত বহু মৈথিলী কাব্যেই নমস্কার বা আশীর্বাদ বা মঙ্গলাচরণে শক্তি-বিষয়ক পদ দেখিতে পাওয়া যায়।[১২]

৭. অমরনাথ ঝা, 'হর্ষনাথ-কাব্যগ্রন্থাবলী'।
৮. অমরনাথ ঝা, 'হর্ষনাথ-কাব্যগ্রন্থাবলী'।
৯. ইউনিয়ন প্রেস, দ্বারভাঙ্গা।
১০. রাজ লাইব্রেরী, দ্বারভাঙ্গা।
১১. ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।
১২. যেমন রমাপতি উপাধ্যায় রচিত 'রুক্মিণী-পরিণয়ে'—
প্রশান্ত রমাপতি তুঅ পদ কিঙ্কর সংকর সুনিয় বিনতি হমারা।
গিরিজা সহিত সকল অঘ দুরী কএ পরসন ভএ দিঅ অভয়বরা॥

অনেকগুলি কাব্যে বিপদে পড়িলেই অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার হইলে নায়িকাকে দেবীর নিকট স্তব করিতে দেখা যায়।[১৩]

গৌরী তপস্যা দ্বারা শিবের মত বর লাভ করিয়াছিলেন। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া সীতার জন্মভূমি মিথিলায় এই প্রবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল যে সীতা গৌরী-আরাধনা করিয়া রামচন্দ্রের মত স্বামী লাভ করিয়াছিলেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানসে'র মধ্যেও আমরা সীতাকে রামচন্দ্রকে বররূপে পাইবার জন্য দেবী আরাধনা করিতে দেখি। মৈথিলী বিভিন্ন কাব্যে ও লোক-সঙ্গীতে এই প্রবাদের কাব্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দা ঝার (জন্ম ১৮৩০) 'মিথিলা-ভাষা-রামায়ণে' দেখিতে পাই, সীতা তাঁহার মায়ের নির্দেশে সখিগণসহ অরণ্যকুঞ্জে পৌছিয়া নানাবিধ বনফুল তুলিলেন এবং নিকটবর্তী তড়াগে স্নান করিয়া বিবিধ স্তবস্তুতিতে দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন।—

জয় দেব মহেশ সুন্দরী। হমছী দেবী অহাংক কিংকরী॥
শিবদেহ নিবাস কারিণী। গিরিজা ভক্ত সমস্ত তারিণী॥
হম গোড় লগৈত ছী শিবে। জননী ভূধররাজ সম্ভবে॥
জনতা মন তাপ নাশিনী। জয় কামেশ্বরি শম্ভু লাসিনী॥[১৪]

আরও অনেক স্তবস্তুতির পরে আসল প্রার্থনা দেখিতে পাই—

অপনে কাঁ হম গৌরি কী কহু। অনুকূলা জনি মেঁ সদা রহু॥
হমরা জে মন মধ্য চিন্তনা। সভটা পূরব সৈহ প্রার্থনা॥

আধুনিক কবি শ্রীসীতারাম ঝার কাব্য 'অম্ব-চরিতে'ও[১৫] দেখিতে পাই জনৈকা হিতৈষিণী ঘরের দাসী সীতা-জননী জনক-গৃহিণীকে বলিতেছে—

গৌরী পূজথু রাজকুমারী। কন্যা হেতুক ঈ ব্রত ভারী॥
সাবিত্রী নিত গৌরি মনোলনি। তহিসঁৌ মন বাঞ্ছিত ফল পৌলনি॥
ইহো পূজি যদি গৌরি মনৌতী। তৌ নিশ্চয় অভিমত বর পৌতী॥

---

১৩. যেমন কবীন্দ্র দেবানন্দ রচিত 'উষাহরণে' নায়ক অনিরুদ্ধ নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া দুর্গার নিকট প্রার্থনা করিতেছে—

জয় জয় দুর্গে জগত জননী। দুর কএ ভবভএ হোহ দহিনী॥
খনে লীনা খনে সিত নিরমান। খন কুঙ্কুম পঙ্ক তনু অনুমান॥
রাকা বিধুমুখ নববিধু মরাল। তত নয়ন সোম কেশ করাল॥
লোহিত রদন লোহিত কর পান। ভৃকুটি কুটিল পুহু মোন ধেআন॥···
পুনি পুনি হই হো দেবি গোচর লৈহ। নাগপাস বন্ধন মোক্ষ দৈহ॥
আনন্দে দেবানন্দ নতি গাব। হরি চঢ়ি রিপু হনি পুরহ ভাব॥

১৪. বলদেব মিশ্র সম্পাদিত, দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়।

১৫. সংস্কৃত বুক ডিপো, বনারস, সং ২০১৩।

শুনিয়া জনক-গৃহিণী রাণীও বলিলেন—

কহুনি দাই কৈঁ গৌরি অরাধথু। শ্রদ্ধা সহিত নিয়ম ব্রত সাধথু॥

সীতাও ঠিক করিলেন—

হমরি মায় জগ মেঁ ছথি প্রাজ্ঞা। পালব অবস হুনক সব আজ্ঞা॥

তাহার পরে দেখিতে পাই, সীতা দীর্ঘ স্তবের দ্বারা গৌরী আরাধনা করিতেছেন। এই স্তব স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রাপ্ত দেবগণের দেবী-স্তবের সহিত মিলিয়া যায়।—

জয় জগ-উৎপতি-পালন-কারিনি, সকল চরাচর হৃদয় বিহারিনি।
জয় জয় বিবিধ দিব্য-তনু-ধারিণি, সকল সাধুজন-সংকটটারিনি॥
অহীঁ কালিকা শিবা ভবানী, লক্ষ্মী অহীঁ অহীঁ ব্রহ্মানী।
দুর্গা অহীঁ অহীঁ ইন্দ্রানী, অহীঁ বুদ্ধি বিদ্যা ও বানী॥
স্বাহা সুরগন তুষ্টি হেতু ছী, স্বধা পিতরগন-পুষ্টি হেতু ছী।
সভক হৃদয় মেঁ ভক্তি রূপ ছী, সভ পদার্থ মেঁ শক্তি রূপ ছী॥ ইত্যাদি।

লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও সীতার এই গৌরীপূজার কাহিনী নানাভাবে দেখিতে পাই। একটি 'গোসাউনিক গীতে' দেখি—

জননী মো পর হোহু সহায়।
ঋষি মুনীস্বর কেঁ উবারল, মারল মহিষা কেঁ জায়॥
সুংভ নিসুংভ অসুর সংহারল, জয় জয় সব্দ মচায়।
জনকনন্দিনী অহাঁকেঁ পুজলনি, রামচন্দ্র-বর পায়॥
কবি বিমতী কালী কে তারল, কিংকর অপন বনায়।
হমরা নহি অবলম্বন আন অছি, অহীঁ ছী এক উপায়॥[১৬]

'গৌরীক-গীত'-এর একটি গীতে জানকীকে জনক-ভবনে বসিয়া গৌরীপূজা করিতে দেখি। ফুল-ফল-বিল্বপত্র, ধূপ-আসন সিন্দূর প্রভৃতি লইয়া দেবীপূজার আয়োজন হইয়াছে।—

গৌরী পূজ্ জানকী জনক ভবন মে
জনক ভবন মে সিব সংকর জী কে সংগ মে।
ফুল লাও ঝট দৈ অছিনজল লাও ছন মে—গৌরী পূজ্…।
কেরা লাও ঝট দৈ ধূপ লাও ছন মে—গৌরী পূজ্…। ইত্যাদি।[১৭]

---

১৬. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

১৭. ঐ। তুলনীয়—

গৌরী পূজয় চললী সখিয়া জনক নগরিয়া হে
জনক নগরিয়া হে সখিয়া মিথিলা নগরিয়া হে
ফুল বেলপত্র লয় গংগজল নীর লয়—গৌরী পূজয়…।
অক্ষত চন্দন লে চললী জনক নগরিয়া হে
জনক নগরিয়া সখিয়া মিথিলা নগরিয়া হে—গৌরী পূজয়…॥ ঐ॥

শুধু স্বামিলাভের জন্য নহে—স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণকে দেবররূপে পাইবার জন্যও সীতা গৌরীপূজা করিয়াছেন।—

জানকী [illegible] অরাধল মন সাধল হে
চলহু নিকুংজবন জাই সুন্দর ফুল লোঢ়ব হে
ডালী ভরি ফুল লোঢ়ল কিছু তোরল হে
পড়ল লছন মুখ দৃষ্ট মনহি লজায়েল হে
জোহী ঠাম সীতা কে নিহরল লট ঝাড়ল হে
চলহু জনকপুর ধাম ওহি ঠাম বিয়াহব হে
পান সিন্দুর গৌরী পূজল বর মাঁগল হে
বর ভেটল শ্রীরাম লছন সন দীঅর হে[১৮]।

মৈথিলী কবিগণের গানে ও কবিতায় দেবীর বিবিধ রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়. আমরা পূর্বে নানা-পসঙ্গে এই জাতীয় অনেক গানের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। মিথিলার লোক-সঙ্গীতে 'গোসাউনিক গীত', 'ভগবতীক গীত', 'গৌরীক গীত' প্রভৃতি যে সকল গীত পাওয়া যায় তাহার বিষয়বস্তুও বিবিধ এবং বিচিত্র। কতকগুলি গান আছে যেখানে দেবীকে সাধারণ মূর্তিতে বা কালী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি মূর্তিতে বর্ণিত হইতে দেখি। যেমন সাধারণ বর্ণনায়—

তোঁহী ঘরনী তোঁহী করনী, তোঁহী জগতক মাত॥ হে মা॥
দশ মাস মাতা উদর মে রাখল, দশ মাস দুধ পিয়াব॥ হে মা॥
নিরংকার নিরংজনি লক্ষ্মীস্বরি, ভবঘরনি তো কহাব॥ হে মা॥
গাইনি মুখ মে গান ভএ পৈসলি, সুস্বর গীত সুহাব॥ হে মা॥
'মংগনীরাম' চরণ পদ লোটথি, ভক্তি মুক্তি বর পাব॥ হে মা॥ [১৯]

কোথাও দেখি কালী বা তারার বর্ণনা। যেমন—

শংকরি শরণ ধয়ল হম তোর।
কুকরম দেখি পরম যদি কোপিত, যমহু করত কী মোর॥

---

১৮. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

১৯. অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তুলনীয়—

জগ জননী পূজৈ ঐলৌ দুআর
অচ্ছত চন্দন ফুলো কে মালা অরহুল ছৈ বিকরাট—জগ জননী…।
হাথ মে কংগন খপ্পর সোভৈ সিন্দুর ছৈ বিকরাট—জগ জননী…।
মাথা মে খুটিয়া ও মালা বিরাজৈ তিরস্থল ছৈ বিকরাট—জগ জননী…।
তু ত্য ভবানী ত্রিলোচন কে রানী, মহিমা ছৈ অগম অপার—জগ জননী…।
শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

সুরতরু অরতর শিবউ উপর, বাস আস অতি ঘোর।
সহস দিবস মনি চান কোটি জনি, তমু দ্যুতি করত ইজোর॥ ··
বামা হাথ কুবলয় ধরু, দহিন খংগবর কাতী।
পাচ কপাল ভাল অতি শোভিত, শিব ইন্দীবর পাতী॥
শিব শব আসন পাস যোগিনীগণ, পহিরন বঘছালা।···
বিকট বদন রসনা লহ লহ কর নব যৌবন মুণ্ডমালা॥
চহু দিশি ফেরব মুণ্ডাবলি, চিতা অগ্নি থিক গেহ।
তীনি নয়ন মণিময় সব ভূষণ, নব জলধর সম দেহ॥ ইত্যাদি।[২০]

আর একটি বর্ণনা পাই সিংহারূঢ়া কালিকার।[২১] এই সিংহারূঢ়া কালিকামূর্তি কালিকা-পুরাণোক্ত কালিকার আদিদেবীত্বেরই প্রভাব সূচিত করে; অর্থাৎ সিংহারূঢ়া কালিকাই আদি দুর্গারূপ, গৌরীরূপ পরে লব্ধ।

জগত্র জননী নাম কালিকা সিংহ পীঠ অসবার হে
জাব জংগল বাঘ ঘেরত তাহাঁ পহুঁচত ভগবতী। ইত্যাদি।[২২]

বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদেও সিংহারূঢ়া বাঘছাল-পরিহিতা যোগিনীবেশ-ধারিণী কালীর বর্ণনা পাই।—

সিংহ চঢ়লি দেবি লেল পরবেশ।
বঘছল পরিহন যোগিনি বেশ॥···
ভনই বিদ্যাপতি কালী কেলি।
সদা রহু মৈয়া দাহিনি ভেলি॥[২৩]

একটি গানে দেখিতে পাই ছিন্নমস্তার বর্ণনা।—

জয় জগজ্যোতি জগতি গতি দাইনি চিকুর চারু রুচি ভালে।
পরম অসম্ভব সম্ভব তুঅ বস পীন পয়োধর বালে॥
কমল কোপ রবি মণ্ডলতা বিচ ত্রিবিধ ত্রিকোণক রেখা।
তা বিচ রতি বিপরীত মনোভব সুষমা সরিত বিশেষা॥
পদ আরোপিত পদলস তা পর অরুণ মান শশিরেহা। ইত্যাদি।[২৪]

'আদিনাথে'র ভনিতায় প্রাপ্ত একটি পদ বিদ্যাপতির বৈষ্ণব প্রার্থনার পদ অস্পষ্টভাবে স্মরণ করায়।—

২০. কৃষ্ণকবি রচিত; অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
২১. ও ২২. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।
২৩ গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সংকলিত।
২৪. অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হম অতি বিকল বিষয় রস মাতল ভগবতি তোহর ভরোশে।
অশরণ শরণ হরণ দুঃখ দারিদ তুঅ পদ পংকজ কোশে॥
বিধি হরি শিব শনকাদিক সুরমুনি পাবি মনোরথ দানে।
তুঅ গুণ যশ বরণন কর অনুছন বেদ পুরাণ বখানে॥ ইত্যাদি।[২৫]

এই লোক-সংগীতগুলির মধ্যে কতকগুলি গানে দেখিতে পাই অত্যন্ত লৌকিকভাবে দেবীকে পূজা ও সেবার বর্ণনা, আর সাংসারিক সুখ-সুবিধা, ধন-জন, আপদ্-মুক্তি, ব্যাধিনাশ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা। দেবী আসিবেন, কোথায় বসিবেন, কি অর্ঘ্য কি উপচার? দেবীর জন্য চাই সোনার আসন, পাট সিংহাসন,—সোনার ঝারি, গঙ্গার বারি—সোনার থালা, কর্পূরের আরতি—সোনার থালায় পায়স—ইত্যাদি ইত্যাদি।[২৬] আবার অন্যগানে দেখি—তিন বস্তুতে মায়ের পূজা হইবে—সিন্দূর ফুল বেলপাতা; তিন বস্তু ভোগে লাগিবে—কলা নারিকেল ডালিম; তিন বস্তু লইয়া আরতি—অগর গুগ্‌গুল আর দীপ; বরদানও চাওয়া হইবে তিনটি—নীতি ধর্ম আর সৌভাগ্য।[২৭] কোথাও দেখি মায়ের নিকট শুধু 'হমর মন পুরা করু'—এই প্রার্থনা,[২৮] কোথাও দেখি বন্ধ্যা অবলার পুত্র-প্রার্থনা,[২৯]

---

২৫. অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২৬. কথী কৈ আসন কথী সিংহাসন— ভগবতী মা কে আনি বৈসাবূ দেবী ললিতা
সোনে কে আসন পাট সিংহাসন— ভগবতী মা কে আনি বৈসাবূ দেবী ললিতা।
সোনে কে ঝারি গঙ্গাজল পানী- ভগবতী মা কে চরন পখারু দেবী ললিতা
সোনে কে থারী কপূরক আরতী— ভগবতী মা কে আরতী উতারু দেবী ললিতা॥
ইত্যাদি। শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

২৭. তীন বস্তু লৈ গৌরী পূজব সিন্দূর ফূল বেলপত্র যো
তীন বস্তু লৈ ভোগ লগৈবহি কেরা নরিয়ল অনার যো
তীন বস্তু লৈ ধূপ দেখৈবহি অগর গুগুল অরু দীপ যো
তীন বস্তু বরদান মাঁগব নেতি ধর্ম অহিবাতি যো॥ ঐ॥

২৮. অম্বে অম্বে কৈ হরদম জপব হম বরু
আস মাতা হমর মন পুরা করু।
পুত্র হমহুঁ অহাঁ কে পরল ছী গরু— আস মাতা⋯।
পাঠ পূজা ন জানী ধ্যান কোনা ধরু— আস মাতা⋯॥ ঐ॥

২৯. এক বিনয় হম গায়ব জননী হম অবলা ছী পুত্র বিনা ছী।
বাঁঝিক পদ ছুড়াও হে জননী গোখুলা বিচ অন্যায় হোইত ছৈ
মথুরাক ফন্দ ছুড়াও হে জননী—
সোনাক থার কপূরক বাতী আরতিক ভেস দেখাও হে জননী॥ ঐ॥

অন্যত্র প্রার্থনা দেখি—অন্ধ আছে মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া—অন্ধের চে দাও, কুষ্ঠরোগী আছে দাঁড়াইয়া—তাহার রোগ দূর কর, নির্ধনকে ধন দাও, বন্ধ্যাকে পু দাও—এই সকল প্রার্থনা।[৩০] কিন্তু গানগুলির সর্বত্রই যে এই অত্যন্ত সাধারণ সংসারীর ন্যায় কেবল 'দেহি দেহি' প্রার্থনা তাহা নহে—কতগুলি গানে বেশ একটা সন্তানভাব এবং হৃদয়ের আকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন 'গোসাউনিক গীতে'র একটি গানে দেখি—

জননী আব কিছু করিয় উপায়—
কী হম করব কতয় হম জায়ব
কে হোয়ত দোসর সহায়॥
জন বিমু অবলম্বন অবলম্বন ধার মে পডলোঁ
চিন্তা সঁ অতি অগুতায়।
আব কৃপা কএ হেরহুঁ জননী
কর ধএ লেহুঁ উঠায়॥
পূজা ধ্যান একা নহি কয়লহুঁ
তদপি ন ত্যাগব মায়।
পুত্র বিকল দেখি জগ-জননী
কোর কৈঁ লেল উঠায়॥
কর চচকার দুলারতি জননী
চিন্তা দেল হটায়।
সৃষ্টিক কারণ অহাঁ জগতারিণি
মাতা সত্য কহায়।
হম সন পুত্র অহাঁক মতি আয়ল
রাখিয়হুঁ সংগ লগায়॥[৩১]

---

৩০. আহে মা কে দুআরি পর অন্ধা খড়ী— মা হে অন্ধাকে নয়না দিও ন কনী।
আহে মা কে দুআরি পর কোঢ়িয়া খড়ী— মা হে কোঢ়িয়াকে কায়া দিও ন কনী।
আহে মা কে দুআরি পর নির্ধন খড়ী— মা হে নির্ধনকে ধন দিও ন কনী।
আহে মা কে দুআরি পর বাঁঝি খড়ী— মা হে বাঁঝিকে পুত্রফল দিও ন কনী। ॥ঐ॥

৩১. তুলনীয়—

সব কৈ সুধি অহাঁ লৈ ছী মাতা
হমরা কিয়ে বিসরৈ ছী হে
সগর রৈনি হম ঠাঢ় রহৈ ছী
দরসন বিন তরসৈ ছী হে
ছিকহুঁ পুত্র অহীঁ কে অম্বা
ঈ তঁ অহাঁ জনৈ ছী হে
সগর রৈনি হাম ঠাঢ় রহৈ ছী
দরসন বিন তরসৈ ছী হে॥ ঐ ॥

একটি গীতে এই আকুতি এবং জগত্তারিণী মায়ের উপরে নির্ভর বেশ মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

জগতারা হমর কষ্ট কহিয়া হরব
ভবতারা হমর কষ্ট কহিয়া হরব।
ভবসাগর মে নৈয়া ডুবল অছি হমর
নহি হেরব পলক হম ডুববে করব,
মা অপনে সে করুআবি জা ঁঠৌ ধরব।
মা উবরবা কে তা নৈ ভরোসা করব
মা সরনো মে আ কএ পরল ছী তুরত
মা নয়ন মুঁদি অহাঁ সুতল ছী কোনা ॥৩২

'জগতারা আমার কষ্ট কবে হরিবে, ভবতারা আমার কষ্ট কবে হরিবে? ভবসাগরে নৌকা ডুবিয়া আছে আমার—আধ পলকও দেরী করিও না নতুবা ডুবিয়াই যাইব; মা তুমি নিজে আসিয়া যে পর্যন্ত না দাড় ধরিবে, সে পর্যন্ত নিস্তারের ভরসা করিব না। মা এইমাত্রই তোমার শরণে আসিয়া পড়িয়াছি- মা তুমি কিভাবে নয়ন মুদিয়া শুইয়া আছ!'

কবি ঈশনাথ কর্তৃক রচিত এইজাতীয় কতকগুলি প্রপত্তিমূলক সংগীত দেখিতে পাই। একটি গানে দেখি—

জে জন গহল অহঁক পদ-পঙ্কজ, পূরল তকর মনকামে।
এক হমহিঁ অতি দীন অভাগল, বহলহুঁ ঠামক ঠামে ॥ মাহে ॥
জঁ কিছু দোষ পড়ল হো জননী, ছমব জানি সন্তানে।
আপন সুতক জঁ লাজ ন রাখব, রাখত কে পুনি আনে ॥ মাহে ॥
অএলহুঁ অহঁক শরণ, হম পামর, অছি মন মে অভিমানে।
মাইক অপন কুরূপহু শিশুপর, রহইছ ভাব সমানে ॥ মাহে ॥৩৩

---

৩২. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ। তুলনীয়—
হে ভবাণী দুখ হরু মা পুত্র আপন জানি কৈ
দৈ রহল ছী ক্লেশ ভারী বীচ বিস্ময় আনি কৈ।
আবি আসা হম পরল ছী কী কহু হম কানি কৈ
হে ভবাণী দুখ হরু মা পুত্র আপন জানি কৈ ॥
দেখি দুর্বল পুত্র কৈঁ মা কী সুতল ছী তানি কৈ
দেখি আসা পূর করনা ফুল তোড়ব হম কানি কৈ
জানি হে মা নিত্য পূজব নেমা ব্রত কৈ ঠানি কৈ ॥ ঐ ॥

৩৩. গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সংকলিত। তুলনীয়—
জগত-জননী মিনতী সুনু মোর। শরণ জানি গহলহুঁ পদ তোর ॥

গৌরী সম্বন্ধে কতগুলি লোক-সংগীত বাংলাদেশের আগমনী বিজয়া-সংগীতের সহিত তুলনা করার যোগ্য। কিছু কিছু বৈচিত্র্যেরও সন্ধান মেলে। যেমন গৌরী ও শিবের পূর্বরাগ। এ-বর্ণনা অনেকখানি রাধা-কৃষ্ণের পূবরাগ বর্ণনার অনুরূপ। প্রেম-কৌশলটিও একজাতীয়। বিদ্যাপতির একটি পদে পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শিব ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া উমাকে দেখা দিয়াছেন- -উমার মন তাহাতেই মজিয়াছে। গোবিন্দ দাসের প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে, কৃষ্ণও গোরখ যোগী সাজিয়া রাধার মান ভাঙাইয়াছেন। একটি মৈথিলী লোক-গীতিতেও দেখি ভিখারীর বেশে শিবের উমা-দর্শনের চেষ্টা।—

হেমন্ত দুআরি পর চন্দনক গছিয়া
তাহি তর যোগিয়া ধূনী রমাবল রে।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে
সুতলী মে ছলি হে গৌরী উঠলি চেহায়—
আগে মায় ডিম ডিম ডমরু কে বজায়।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে—
থারি ভরি লেলনি গৌরী:চংগেরী ভরি লেলনি
মাই হে উপর সঁ লেলনি দূবি ধান হে।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে—
ভিখিয়ো নে লৈ ছৈ হে যোগী মুখহু ন বোলৈ
ঘুরি ঘুরি গৌরীকে নিরেখৈ হে।
তপসী:যোগী ভিক্ষা মাঁগে
হম নহি থিকহুঁ হে গৌরী ভিক্ষু ভিখারী
তোহরো সুরতিয়া দেখ ভুলেলোঁ হে।[৩৪]

আপন সুতক লখি সঙ্কট ঘোর। কওন জননি নহি বহবএ লোর॥
কএল জনম ভরি পাপ-বটোর। সদিখন রহলহুঁ মদহিঁ বিভোর॥··
ঈশনাথ একরে টা জোর। মাইক হিঅ নহি রহএ কঠোর॥ ঐ॥

আরও— আবহু তাকিঅ হে জননী॥
অধম উধারিণি, তারিণি, সুত দিসি হেরিঅ সদয় কনী॥
সভ পাওল মন-কাম, নাম তুঅ জপি, সঙ্কট-হরণী॥
হমরহি বিসরি দেল কিএ, অই নহি, এহন কঠোর বনী॥···
হো কুপূত, নহি মাএ কুমাতা, হোইত কতহু সুনী॥
কী হমহী ছী এহন অভাগল, জে নিত মাথ ধুনী॥

কবি জীবানন্দ রচিত ; ঐ॥

৩৪. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

হেমন্তের (গৌরী-পিতা) দুয়ারে চন্দনের গাছ—তাহারই নীচে যোগী ধূনী রাখিল। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। শুইয়াছিল গৌরী—চেঁচাইয়া উঠিল,—ওগো মা, ডিম ডিম ডমরু কে বাজায়! তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। থালি ভরিয়া আনিল গৌরী—চাঙ্গেরী ভরিয়া নিলেন গৌরী—মা গো, তাহার উপরে রাখিলেন ধান-দূর্বা। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। ভিক্ষা না লয় যোগী—মুখে না কথা বলে—শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া গৌরীকে নিরীক্ষণ করে। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। 'আমি ভিক্ষু-ভিখারী নহি হে গৌরী, তোমার রূপ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি!'

একটি গানে গৌরীর স্বামীর সঙ্গে তাহার শ্বশুরবাড়িতে দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র করুণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পানের মত পাতলা—ফুলের মত সুন্দরী গৌরী, কোন্ বনে যাইবে? যেখানে তপোবনে তপস্বী ভিখারি সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে পরে গৌরী চিরকাল কত আভরণ—কোন্ বনে যাইবে এই গৌরী? যেখানে বনে বনে কাঠ খোঁজা হয়, সেই বনে যাইবে গৌরী। শ্বশুরবাড়িতে পরে গৌরী ছেঁড়া পুরাণ কাপড়—সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে খায় গৌরী পুরি ও জিলেপী—কোন্ বনে যাইবে এই গৌরী? শ্বশুরবাড়িতে আছে ভাঙ খাবার—সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে শোয় গৌরী কোমল পালঙ্কে—কোন্ বনে যাইবে এই গৌরী? শ্বশুরবাড়িতে আছে ভূমি আশ্রয় —সেই বনে যাইবে গৌরী।[৩৫]

---

৩৫. পান সন পাতর গৌরী ফুল ঐসন সুন্দরি হে।
কোন বন জৈতী—
তপোবন তপসী ভিখারী হে ওহি বন জৈতী।
নহিরা মে পিহুতী গৌরী চির আভরন মা হে
কোন বন জৈতী—
বন বন লকরী চুনৈ তী হে ওহি বন জৈতী।
সসুরা মে পিহুতী গৌরী গুদরী পুরনমা হে
ওহি বন জৈতী।
নহিরা মে খৈতী গৌরী পূরী ও জিলেবী
কোন বন জৈতী।
সসুরা মে ভাংগ আধার হে ওহি বন জৈতী।
রংগকে রংগীলী গৌরী প্রেমকে সুন্দরী—
কোন বন জৈতী—
নহিরা মে সুততী গৌরী ললিয়া পলংগিয়া হে
কোন বন জৈতী
সসুরা মে ভুইয়াঁ অধার— ওহি বন জৈতী॥ ঐ॥

অন্য একটি গীতে দেখিতেছি, এইরূপ ঘরে বরে গৌরীকে দিয়া মা মেনকার দুশ্চিন্তা ও খেদের অন্ত নাই। স্বামীর ঘরে যে গৌরীর দুঃখের অন্ত নাই। স্বামী পাগলা ভোলা যে গাঁজাখোর ভাঙখোর—ভোজনে ধুতুরা ও আঁক; বসিয়া খাইবার ঘর-দুয়ারও নাই। ঋষিরাজ নারদ যে ডাকাতি করিয়াছেন! অঙ্গে তাহার সাপের হার—অঙ্গে অঙ্গে ব্যাপ্ত বিষ। ঘোর পাপের ফলেই নিশ্চয় এইরূপ হইয়াছে, গৌরী ভয়ে মরিয়া যাইবে। শ্মশানে বনে বাস—ব্যাঘ্রচর্ম আসন! না জানি গৌরীর কি হইতেছে!

নহি জনী আব গৌরী দুখ কোন কোন পৌতী
গঞ্জখোর ভাংগ পীবা ভোলাক সংগ জৈতী॥
ভোজন ধতূর আকে ঘর ছৈ ন দুআর থাকে
ঋষিরাজ দেল তাকে বেটা হমর কী খৈতী।
নহি জানি আব গৌরী···
বৈদেহ হার সাঁপক বিষ অংগ অংগ ব্যাপক
ফল থিক ঘোর পাপক ডর ফোকি মরি জৈতী।
রহতী শ্মসান বন মে নহি জানি কেনা হোইতী
বঘচর্ম ছৈহি আসন তৈয়ো ত্রিলোক সাসন
সিব কে ত্রিয়া কহৌতী॥[৩৬]

আর একটি পদে দেখি, একদিন স্বামী-পুত্র কাহাকেও সঙ্গে না করিয়া একা একা গৌরী মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত। মা মেনকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভরা যমুনায় কেমন করিয়া আসিলে গৌরী?' গৌরী বলিল,—'মা, আমি শাড়ি ভিজাইয়া আসিয়াছি।' 'বৃষ ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিলে গৌরী?' 'মা, বৃষের দড়ি ধরিয়া আসিয়াছি।' 'গণপতিকে কি করিয়া ছাড়িয়া আসিলে গৌরী?' 'মা, গণপতিকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছি।' 'মহাদেবকে কি করিয়া ছাড়িয়া আসিলে গৌরী?' 'মহাদেবকে পূজায় বসাইয়া দিয়া আসিয়াছি মা।'[৩৭]

---

৩৬. তুলনীয় ঈশনাথ রচিত একটি গীত-
গৌরা! কথিলএ করব বিআহ॥
এহন দিগম্বর বুঢ়বা বরসঁ, কথিলএ করব বিআহ॥
নহি ভরি বীত খেত ছনি হিনকা, নহি হর ও হরবাহ॥
ভীখ মাঙিকেঁ পেট পোসৈ ছথি, অইক কোনা নিরবাহ॥ ইত্যাদি।
—গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সংকলিত।

৩৭. গৌরী হে ভরল জমুনা কোনা এলৌ।
আমা হে সরিয়া ভিজৈতে হম এলৌ॥
গৌরী হে বসহা কে ছোড়ি কোনা এলৌ।
আমা হে বসহা কে ডোরিয়া ধরি এলৌ॥

অন্য একটি গানে পাই ভাঙখোর স্বামীর সঙ্গে গৌরীর গার্হস্থ্য জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র। গানটি তুলসীদাসের নামে প্রচলিত।

ভএ গেল ভাংগ কে বেরা
　　উঠু হে গোরা।
হম কোনা উঠব ঈসর মহাদেব
　　কার্তিক গনপতি মোরা কোরা।
ভএ গেল ভাংগকে বেরা
আসন খসায় দিঅ
　　কার্তিক সুতায় দীঅ
পীসি দীঅ ভাংগকে গোলা
　　উঠু হে গোরা।
ভএ গেল ভাংগকে বেরা
নৈ ঘর সাসু ননদ জে ছথি
　　কে রাখত কাতিক কোরা
উঠু হে গৌরা, ভএ গেল গেল বেরা।
তুলাসীদাস প্রভু তুম্হরে দরস কো
　　মহাদেব কে হৃদয় কঠোরা।
　　উঠু হে গৌরা॥

মহাদেব ডাকিতেছেন,—'হইয়া গেল ভাঙের বেলা, উঠ হে গৌরা।' গৌরী বলিতেছেন,—'আমি কেমনে উঠিব ঈশ্বর মহাদেব, কার্তিক-গণপতি যে আমার কোলে।' আবার ডাকেন মহাদেব, 'ভাঙের বেলা হইল, ওঠ হে গৌরা। আসন খসাইয়া (বিছাইয়া) দাও, কার্তিককে শোওয়াইয়া দাও—ভাঙের গোলা পিষিয়া দাও, ওঠ হে গৌরা।' গৌরী বলিতেছেন, -'ঘরে নাই শাশুড়ী—নাই ননদ, কে রাখিবে কার্তিককে কোলে?' কিন্তু তবু হাক-ডাক,—'ওঠ হে গৌরা'। তুলসীদাস বলিতেছেন,—'তোমার দর্শনের জন্য আমি ব্যাকুল; কিন্তু হৃদয় কঠোর।'

একেবারে আধুনিক কালের মৈথিলী সাহিত্যে আর একটি প্রবণতা লক্ষ্য করিতে পারি। সমগ্র দেশে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব দেখা দিয়াছে—এই বিপ্লবের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশ চাহিতেছে একটি নূতন যুগান্তকারী বিবর্তন। শোষকের নির্মম অত্যাচারে

গৌরী হে গণপতি কে ছোড়ি কোনা এলৌ।
আমা হে গণপতি কে ঠোকি সুতেলৌ॥
গৌরী হে মহাদেব কে ছোড়ি কোনা এলৌ।
আমা হে মহাদেব কে পূজ পর বৈলায় এলৌ॥ ঐ॥

এবং শোষিতের আর্তরবে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই লোভী শোষকরূপ দানবের দলনের জন্য মা যেন নিজেই আবার রক্তপিপাসু হইয়া উঠিয়াছেন— নিজেই আবার সমরাঙ্গনে আবির্ভূতা হইতে চাহিতেছেন। এইজাতীয় একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

শোণিত দে শোণিত মৈথিলায
প্যাসেঁ তবধল অছি খড়্গ হমর
বড়বানল ছুধা ধরাতল কেঁ
সংহার করৈ পরতচ্ছ ঠাঢ়ি
অছি খপ্পর ছুচ্ছে যুগ যুগ সঁ
খল খল কয় প্রাণিক প্রাণ বাঢ়ি
মারুত গতি বঢ়ি গেল দিগ দিগন্ত
ধুধুআএল ধুম কহেস প্রখর
ই প্রকৃতি ক্লান্ত ক্রন্দন করইছ
স্পন্দন প্রাণিক রুদ্ধ ভেল
শোষিত ক আহুতি দেখি দেখি
শোষক পর মন মোর ক্রুদ্ধ ভেল
আএল ছী উঠ দে মাংস একর
হম পেট ভরব পুনি করব সমর।[৩৮]

---

৩৮ ক্রান্তি-গীত, রাঘবাচার্য শাস্ত্রী রচিত। কলিকাতা 'মৈথিল-সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত।
এই প্রসঙ্গে বাঙলা দেশের পঞ্চাশের মন্বন্তরকে লইয়া রচিত এই কবিতাটি তুলনীয়—
ভূখ ভবানী জো দেতী হৈ
ভূখ ভবানী বংগদেশ কী
যা দেবী বঙ্গদেশেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ···
যা দুর্গা বঙ্গদেশেষু দৈন্যরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ··
যা কালী বঙ্গদেশেষু কালরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ ·

বেথুন সোসাইটি

অষ্টম প্রস্তাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেথুন সোসাইটির কার্য্যকলাপ আমরা এযাবৎ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা গিয়াছে যে সমাজ-কল্যাণ চিন্তায় ইহার কর্তৃপক্ষ বরাবর নিরত ছিলেন। সোসাইটির বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বহু বিদগ্ধ সুধী ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রবন্ধপাঠ বা বক্তৃতার শেষে সদস্যগণ ইহার আলোচনায় শুধু যোগ দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধেও তাঁহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এইরূপ একটি সংস্কৃতিমূলক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের মধ্যে থাকিয়া সমাজের যে বিশেষ কল্যাণ-সাধন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি !

১৮৬৭-৬৮ সনের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয় ২৮ নবেম্বর, ১৮৬৭ তারিখে। সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি, বিচারপতি ফীয়ার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতিরূপে তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বরাবর তিনি মাসিক বা সাধারণ অধিবেশনগুলিতে শুধু পৌরোহিত্য করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না, নিজেও কোন কোন সময়ে মূল বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, এবং প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনেই উপসংহার বক্তৃতায় তিনি নিজ অভিমত এবং কার্য্যকর মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। সভাপতি ফীয়ার ভারতবর্ষের সত্যকার হিতৈষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁহার মতামত আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় না হইলেও ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর স্থায়ী হিতসাধনকল্পে তাঁহার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

এই প্রথম মাসিক বা সাধারণ অধিবেশনে সোসাইটির বৈষয়িক ও আভ্যন্তরিক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর (৬ই জুন, ১৮৬৭) বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া সভাপতি ফীয়ার তাঁহার গুণপনা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে যাঁহারা ইহার প্রাথমিক সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শম্ভুনাথ পণ্ডিত একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ কৃতীবলে ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যে এবং ব্যবহার-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে প্রথম ভারতীয়-রূপে বসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ জনহিতকর কর্ম্মে আমৃত্যু লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার গভীর আইন জ্ঞান, মধুর ব্যবহার এবং সোসাইটির উন্নতি সম্বন্ধে আকূতির বিষয় উল্লেখ করিয়া সভাপতি সহকর্ম্মী শম্ভুনাথের বিশেষ প্রশংসা করেন। এই অধিবেশনে শম্ভুনাথের স্থলে সোসাইটির সহকারী সভাপতি পদে বৃত হন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোসাইটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিবিধ কর্ম্ম পরিচালনা আরম্ভ করেন। মধ্যে এই সকল শাখা প্রায় স্তিমিত হইয়াছিল। এবারে দেখিতেছি শাখাগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক শাখারই সভাপতি এবং সম্পাদকও সোসাইটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শাখাগুলি ও প্রত্যেক শাখার সভাপতি ও সম্পাদকের নাম এই ঃ

১. শিক্ষা বিভাগ : হেন্‌রী উড্রো, সভাপতি
রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, সম্পাদক

২. সাহিত্য ও দর্শন : পাদ্রী কৃষ্ণমোহন, সভাপতি
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক

৩. স্বাস্থ্য : ডাঃ ইউয়ার্ট (Ewart), সভাপতি
ডাঃ কানাইলাল দে, সম্পাদক

৪. সমাজ বিজ্ঞান : পাদ্রী জেম্‌স্ লঙ্‌, সভাপতি
লালবিহারী দে, সম্পাদক

৫. স্ত্রীজাতির উন্নতি : দ্বারকানাথ মিত্র, সভাপতি
হরশঙ্কর দাস, সম্পাদক

দেখিতেছি শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগ সম্পর্কে এই অধিবেশনে কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগের সভাপতি পদে কয়েক বৎসর যাবৎই কার্য্য করেন কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ। তিনি কোন কারণে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে সভাপতি পদ প্রদত্ত হয় দ্বারকানাথ মিত্রকে। দ্বারকানাথ প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী। তিনি কিছুকাল পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহার প্রযত্ন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য শাখার সভাপতি ও সম্পাদক পদেও যে ঐ সময়ের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ মনোনীত হইয়াছিলেন তাহা নাম দৃষ্টে আমাদের বোধগম্য হয়।

এদিনকার সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সভাপতি ফীয়ার স্বয়ং। তিনি বক্তৃতাদান করিতে উঠিলে তাঁহার স্থলে কিশোরীচাঁদ মিত্র সাময়িক ভাবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ফীয়ারের বক্তৃতার বিষয় ছিল—"Women Teachers for Women" অর্থাৎ ছাত্রীদের জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী। ঐ সময়ে কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের উপস্থিতির সুযোগ লইয়া এদেশে বালিকাদের মধ্যে যথাযথ শিক্ষাপ্রসার ও ইহার উন্নতিকল্পে একটি 'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল' বা স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সুরু হয়। কুমারী কার্পেণ্টারও ছিলেন এইরূপ একটি ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল স্থাপনের বিশেষ পক্ষপাতী। বলাবাহুল্য বিচারপতি ফীয়ার এই প্রযত্নের সপক্ষে ছিলেন। শুধু তাহাই নয় এই ধরনের বিদ্যালয় যাহাতে সত্বর প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্যও তিনি নানাভাবে যত্ন লইয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় ইহার সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিকতার যথেষ্ট পরিচয় মিলে। তিনি এই মর্ম্মে বলেন যে, আট, দশ বা বার বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েরা বালিকা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতদের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন কিন্তু এই অল্পবয়স্কাদের মধ্যেও এমন কতকগুলি

বিষয় আছে যাহা তাহারা পুরুষ শিক্ষকদের নিকট বলিতে ইচ্ছুক নয় বা ভরসা পায় না। তাহাদের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করা নারী-শিক্ষয়িত্রীদিগের পক্ষেই সম্ভব। এ কারণ স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে নারী-শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি আরও বলেন যে, সমাজের অর্দ্ধেক সংখ্যক লোককে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন রাখিলে দেশের কি সমাজের কাহারও যথার্থ উন্নতি হইতে পারে না। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজ পরিবারের কথা উল্লেখ করেন। সেখানে শিক্ষিতা স্ত্রী সুনিপুণ ভাবে গৃহস্থালী কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন। গৃহকর্ম্মের চিন্তা হইতে রেহাই পাওয়ায় পুরুষেরা বিভিন্ন বিষয়ে কত কার্য্য করিতে সক্ষম হন।

বক্তৃতাশেষে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে পাদ্রী ড্যাল, ল্যাজারাস, পার্কার, নাইট এবং কয়েকজন বাঙ্গালী সদস্য আলোচনায় যোগ দেন, বক্তা ফীয়ারের মূল বক্তব্য বিষয় মানিয়া লইলেও কোন কোন বিষয়ে কেহ কেহ ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। পাদ্রী ড্যাল বলেন যে, পুরুষ শিক্ষক সকল ক্ষেত্রেই যে অবাঞ্ছনীয় এ কথা বলা যায় না। একজন বাঙ্গালী সদস্য বলেন যে, বাঙ্গালী সমাজের অর্দ্ধেক বা নারীগণ নানা বিষয়ে অজ্ঞ এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন এ কথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যাহা হউক বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদানের পর এইদিনকার অধিবেশন শেষ হয়।

সোসাইটির দ্বিতীয় মাসিক বা সাধারণ অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ১৯শে ডিসেম্বর। অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—A Visit to the Punjab বা পাঞ্জাব পরিদর্শন। এই বক্তৃতায় তিনি পাঞ্জাবের শিখ জাতি ও শিখ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শিখ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানক। তিনি ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে মার্টিন ল্যুথার (১৪৮৩ খ্রী.) এবং বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৫ খ্রী.) আবির্ভাবে বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ চিন্তায় যুগান্তর সূচিত হয়। শিখদের দশম গুরু গুরুগোবিন্দ সিং শিখ-ধর্ম্মাশ্রয়ীদের একটি যোদ্ধ-সমাজে পরিণত করেন। শিখ ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদের স্থান নাই, যদিও বিবাহাদি বিষয়ে শেষোক্তটির উর্দ্ধে তাহারা যাইতে পারে নাই। নিম্নশ্রেণীর শিখদের ভিতরে এক প্রকারের বিধবাবিবাহও প্রচলিত রহিয়াছে বলিয়া বক্তা উল্লেখ করেন। ইংরেজী শিক্ষার কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্তন হইলেও স্ত্রীশিক্ষা তাহাদের মধ্যে একরূপ নাই বলিলেই চলে। পাঞ্জাবে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চ্চার জন্য একটি সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছে। "সঙ্গত"-সভায় সমাজের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা যোগ দিয়া ধর্ম্মীয় মূল তত্ত্বাদির সম্বন্ধে আলোচনার একটি আয়োজনও করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র শিখ জাতির সামরিক শক্তির বিশেষ প্রশংসা করেন। ভারতের মহাজাতি গঠনে তাহাদের সহযোগিতা যে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে তাহা তিনি বলিতে ভুলেন নাই। কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভ্রমণ করিয়া ঐ ঐ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করিয়াছেন। নিজ বাঙ্গালী-সমাজের স্বকীয়তা তিনি অবগত। এই তিন প্রদেশবাসীর সঙ্গে পাঞ্জাববাসীর মিলন ঘটিলে ভারতবর্ষ কিরূপ

একটি মহৎ, সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে, তাহার বিষয়ও তিনি বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন। ইহার কোন কোন অংশগুলি এ যুগেও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— "...Now what he had seen of Madras, Bombay, Bengal and the Punjab, he was of opinion that each had a noble and distinctive mission to accomplish, and that much depended upon the blending all the races by instituting a system of active co-operation among the educated natives of all Presidenceis and Provinces. The Bethune Society, which has hither to done much in the way of speaking and writing, should, he thought, enter the sphere of action and become the focus of such co-operation and fellowship among the educated natives of India. He entertained the hope that under the able Presidency, and the wise counsel and warm philanthropy of the honorable gentleman who occupied the chair, the Bethune Society would yet live to fulfil the high mission reserved for it." (P. Cxv.) অর্থাৎ, বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বেথুন সোসাইটি এযাবৎ বক্তৃতা-প্রবন্ধ-আলোচনাদির দ্বারা এইরূপ একটি মিলন-ক্ষেত্রের পথ দেখাইয়া আসিতেছে। সোসাইটির বর্ত্তমান কর্ণধার সচেষ্ট হইলে ইহাকেই একটি সমগ্র ভারতের মিলনস্থল করিয়া তোলা যাইবে। ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে ইহার কার্য্যকরতা খুবই বেশী।

এই বৎসরের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হয় পরবর্ত্তী ৯ই জানুয়ারী, ১৮৬৮ দিবসে। এদিনকার প্রধান বক্তা ছিলেন বেথুন সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি মেজর জি. বি. ম্যালেসন। বক্তৃতার বিষয়—"Native Dynasties in India", অর্থাৎ ভারতবর্ষের দেশীয় রাজবংশ। বক্তা ম্যালেসন গত শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা-গবেষণার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। তিনি এদিনকার ভাষণে প্রথমেই বলেন যে বক্তব্য বিষয় ব্যাপক না করিয়া তিনি মাত্র একটি রাজ্য ও রাজবংশের কথা বিবৃত করিবেন।

তিনি বলেন, মহীশূর রাজ্যের পত্তন করেন চামরাজ ১৫০৭ সনে। তাঁহার হাতে ছয়টি আঙুল ছিল বলিয়া তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হয়। এই রাজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে চামরাজের বংশধরদের সুকীর্ত্তি ও কুকীর্ত্তি রহিয়াছে বিস্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহীশূরে হায়দার আলির অভ্যুদয় হয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। তবে রাজবংশ বহির্ভূত এবং রাজবংশের সঙ্গে সম্বন্ধহীন এক ব্যক্তিকে নামে মাত্র "রাজা" করিয়া লন। হায়দার আলি ১৭৮২ সনে এবং উক্ত "রাজা" ১৭৯২ সনে মারা যান। শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা এবং শিশু পুত্রকে হায়দার আলির পুত্র টিপু সুলতান একটি অপরিচ্ছন্ন কুটিরে বন্দী করিয়া রাখেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি যখন শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করেন তখন তিনি এই দুই ব্যক্তিকে উক্ত কুটিরে পান।

ওয়েলেস্‌লি মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ নিজামকে অর্পণ করেন, কিয়দংশ ব্রিটিশের খাস অধিকারে আনেন এবং বাকী অংশের উপরে উক্ত কুটিরে পাওয়া ছেলেটিকে ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি একটি কমিশনের উপর এই ব্যক্তির যথোপযুক্ত শিক্ষার ভার দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়া যায়, শাসনে অনাচারও চরমে ওঠে। শেষে ব্রিটিশ সরকার ইহাকে এককালীন মোটা টাকা পেনশন দিয়া মহীশূরের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

ম্যালেসানের বক্তৃতার মর্ম্ম ছিল এই। কিন্তু ইহা লইয়া এই সভাতেই বিষম বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিতর্কে মৌলবী আব্দ‌ুল লতিফ, পাদ্রী লঙ্‌, লালবিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সোসাইটির সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু যোগদান করেন। মৌলবী আব্দ‌ুল লতিফ সাধারণভাবে বক্তাকে ধন্যবাদ দানের পর পাদ্রী লঙ্‌ বলেন যে শাসন ব্যাপারে প্রজাদের কল্যাণই আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁহাদের উপর অত্যাচার অনাচার হইলে আশু প্রতিবিধান হওয়া বিধেয়। এই কথার পরেই বিতর্ক খুব জোরালো হইয়া উঠে। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লালবিহারী দে এই মর্ম্মে বলেন যে, দেশমধ্যে অনাচার-অত্যাচার সংঘটিত হওয়ার অছিলায় প্রতিবেশী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহাদের এই উক্তির লক্ষ্য ছিল মহীশূর রাজ্যে ব্রিটিশের হস্তক্ষেপ, একথা বলাই বাহুল্য। বক্তা ম্যালেসন এই বিতর্কের উত্তরে বলেন যে, একটি দেশীয় রাজ্য বা রাজবংশকে হীন প্রতিপন্ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। মহীশূরের মূল রাজবংশের অনেকেই যে প্রজাবৎসল ছিলেন একথা তিনি বলিয়াছেন। মহীশূরের সমৃদ্ধির মূলেও ছিল রাজাদের এবম্বিধ সুশাসন।

চতুর্থ অধিবেশনে (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮) প্রবন্ধ পাঠ করেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয়—"The Proper Place of Oriental Literature in Indian Education," অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের স্থান। কৃষ্ণমোহন বক্তৃতায় ইংরেজী ও সংস্কৃত তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার অনুকূলে যুক্তি প্রমাণসহ নিজ বক্তব্য বিশদভাবে পরিবেশন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন একজন সদস্য নিছক প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষাদানরত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কলেজের মর্য্যাদা দিয়া মঞ্জুরী দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহারই প্রতিবাদে তাঁহার এই প্রবন্ধ। তিনি ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের ক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে হোরেস হেম্যান উইলসনের কৃতিত্ব সর্ব্বজন স্বীকৃত। তিনি সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজকে একই গৃহে স্থান দিয়া উভয়কে উভয়ের পরিপূরক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক বলেন, হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষা করিলেও তিনি সেই প্রথম যুগে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া সংস্কৃত পড়িতেন সংস্কৃত কলেজে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহনও বক্তৃতায় সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা

বিশদভাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। তিনি উদাহরণ দিয়া দেখাইলেন যে, ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চলে (যেমন বাঙ্গালায়) ইংরেজী শিক্ষার প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই সব অঞ্চলের ভাষাগুলিও বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তিলাভ রহিয়াছে এই ধরনের সমৃদ্ধির মূলে। কিন্তু বাংলা তথা দেশ-ভাষাগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং দ্রুত উন্নতির পক্ষে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের অনুশীলনও একান্ত প্রয়োজনীয়। বক্তা এই সারগর্ভ বক্তৃতাটিতে এ সকল কথা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। শিক্ষা-কর্তৃপক্ষেরও যে এ বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে তিনি ভোলেন নাই।

বক্তৃতার মূল লক্ষ্য ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে কলেজী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে ইহা লইয়া এবারেও বিশেষ বিতর্কের উদ্ভব হয়। এই বিতর্কে যোগ দেন এইচ্. এল. পোয়ার ওয়াইন, যদুনাথ ঘোষ, সার রিচার্ড টেম্পল (পরবর্তী কালে বঙ্গের ছোটলাট)। পাদ্রী লঙ্, পাদ্রী ডি. মারে মিচেল এবং সভাপতি স্বয়ং। ওয়াইন বলেন, দেশভাষার মাধ্যমে কলেজী শিক্ষাও যাহাতে প্রদত্ত হইতে পারে তাহার উপায়-চিন্তার সময় আসিয়াছে। তখন হইতেই এই সকল ভাষায় বিবিধ বিদ্যার পুস্তক রচনা যে সুরু হইয়াছে তাহার প্রসারকল্পে উৎসাহদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেন। সার্ রিচার্ড টেম্পল বলেন যে বোম্বাই প্রদেশেও একটি উচ্চশিক্ষিত বিদগ্ধসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সভাপতি ফিয়ার অধিবেশন সমাপ্তির পূর্ব্বে উপসংহার বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দুইটি দিকের পার্থক্য বা তারতম্য প্রদর্শন মূল বক্তার অন্যতম লক্ষ্য। এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। "Popular Education" বা জনসাধারণের শিক্ষা এবং "Liberal Education" বা উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক স্তরে দেশ-ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার বেলায় অন্যকথা। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানে মৌলিক পুস্তক রচিত না হইলে উচ্চশিক্ষায় দেশভাষা প্রাচ্যভাষাকে তথা প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে শিক্ষার বাহন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠকের মূল বক্তব্যের দিকে সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অধিবেশন সমাপ্ত করেন।

পঞ্চম অধিবেশন হয় পরবর্ত্তী ১২ই মার্চ্চ। ঐদিনকার মূল বক্তা এইচ্. এল. পোয়ার ওয়াইন। বক্তৃতার বিষয়—Bodily Training as an Agent in National Regeneration বা জাতীয় পুনরুজ্জীবনে শরীর চর্চ্চার স্থান।

এই বক্তৃতায় শারীরিক শক্তির বিকাশের উপায় সমূহ বিশদভাবে ব্যক্ত করা হয়। বিভিন্ন জাতির উত্থানপতনের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা বলেন যে, উহাদের প্রত্যেকের

ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে শারীরিক শক্তির উন্মেষ সাধনা প্রয়াসের তারতম্যের উপরে ইহা বারবার নির্ভর করিয়াছে। কোন জাতির সত্যকার উন্নতি, কি চিন্তায়, কি কর্ম্মে, করিতে হইলে তাহার অন্তর্গত জনসাধারণের স্বাস্থ্য তথা শারীর-শক্তি উন্নত হওয়া আবশ্যক। সাহস এবং শারীর-শক্তি দুইয়ের মিলন হইলে অঘটন ঘটান যাইতে পারে। স্বাস্থ্যবান লোকের ভিতরেই সাহসের আধিক্য সচরাচর দেখা যায়। মানসিক শক্তির বিকাশ সম্ভব করিতে হইলেও দেহকে সুস্থ ও সবল করিয়া লইতে হইবে।

বক্তৃতার পর বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন সোসাইটির অন্যতম সদস্য তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রসঙ্গত যে কয়টি কথা বলেন তাহা বড়ই প্রণিধানযোগ্য। সোসাইটির কার্য্য বিবরণে তাঁহার উক্তি এইরূপ বিধৃত রহিয়াছে—"...The subject was one that did not admit of much discussion. He thought also, that it was too early to expect the fruits of English education in this country, education being more an exotic than a natural growth of the country. Education, in the highest sense of the term, must be one of national development to be of any use to a country. That result, however he thought, was not to be expected in India, so long as the vast superiority of the English race caused itself to be felt by the natives and produced in their minds an overwhelming sense of their own inferiority. The two nations, he thought, must be amicably parted, before anything good or great could be achieved by the people of this country."—P. Cxxii

উদ্ধৃত অংশ হইতে তারাপ্রসাদের এরূপ মন্তব্য প্রকাশের কারণগুলি বুঝা যাইবে না। তবে মূল বক্তার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় পুনর্জন্ম বা পুনরুজ্জীবনে শারীরিক শক্তি উন্মেষের আলোচনা। তারাপ্রসাদ হয়ত বলিতে চাহিয়াছেন জাতীয় পুনরুজ্জীবন তখনই সম্ভব যখন ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতার পরিবেশে কার্য্য করিবার সুযোগ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরেজী শিক্ষার কথা তিনি উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। আমরা যতই ইংরেজী শিক্ষা লাভ করি না কেন ইংরেজের মত প্রবল ও স্বাধীন প্রতিপক্ষের সম্মুখে পরাধীন বলিয়া আমাদের মনে হীনমন্যতা বোধ জন্মিবেই। তাই তিনি মনে করেন ইংরেজ আপোষে এদেশ হইতে চলিয়া গেলে স্বাধীন পরিবেশে আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবন তথা সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইবে। সাহস এবং শারীরিক শক্তি যুগপৎ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদর্শন করিতে পারিব।[১] তারাপ্রসাদের পর আরও কয়েকজন সদস্য আলোচনায় যোগদান করেন এবং কেহ কেহ তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া ইহার সমালোচনা করেন। হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র বলেন যে, বাঙ্গালী সন্তানেরা ইতিমধ্যেই শারীর-চর্চ্চায় মনোযোগী হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের দ্বারা একটি ভলান্টিয়ার কোর বা

---

১. লেখক ১৯৪৫ সনে "মন্দিরা"য় এবং ১৯৪৬ সনে (জুন-জুলাই) প্রকাশিত "জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ" পুস্তকে তারাপ্রসাদের ইংরেজী উক্তিটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হইয়াছে। সম-সময়ে শারীর-চর্চ্চার বেশ ধুম পড়িয়া গিয়াছে, এজন্য পল্লীতে পল্লীতে কুস্তির ও ব্যায়ামের আখড়াও স্থাপিত হইতেছে।

অন্যান্য বক্তার মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, মানসিক শক্তি বিকাশে শারীর-চর্চ্চার প্রয়োজন নাই। সভাপতি ফিয়ার উপসংহার বক্তৃতায় এরূপ চাঞ্চল্যকর উক্তির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই আলোচনায় কিশোরীলাল সরকার, কালীমোহন দাস এবং পাদ্রী ডাঃ মারে মিচেলও যোগদান করেন।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইল ১৬ই এপ্রিল ১৮৬৮ তারিখে। এদিনকার প্রধান বক্তা হেনরী উড্রো "The Indian Civil Service Examination" বা ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। সভা বিলম্বে আরম্ভ হওয়ায় বক্তাকে তাঁহার ভাষণ অসম্পূর্ণ রাখিতে হয়। বক্তা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একটি পরিসংখ্যান-চার্ট প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত সভ্যদের দেখান। তিনি বক্তৃতার একস্থলে মনোমোহন ঘোষের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিষয়-বিশেষের উপরে অতিরিক্ত জোর দেওয়াই তিনি পরীক্ষায় বিফলমনোরথ হইয়াছেন, সংস্কৃতের নম্বর কমাইয়া দেওয়াতে এরূপ হয় নাই।

বক্তৃতা অন্তে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনায় যোগদান করেন। তিনি এই মর্ম্মে বলেন যে, ভাবী ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীগণ যে সব ক্লাসিকসে (যেমন, গ্রীক) অধিক নম্বর দেওয়া হইয়াছে, তাহার শিক্ষায় ও অনুশীলনে যেন মন দেন। সোসাইটির অন্যতম সদস্য ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ অতঃপর আলোচনায় যোগ দেন। তিনি মূল বক্তার প্রতি এই বলিয়া অনুযোগ করেন যে, তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। তাঁহার অসাফল্যের কারণ উড্রোর বক্তৃতায় প্রকাশ পায় নাই। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতের নম্বর সাড়ে তিন শত হইতে হঠাৎ কলমের এক খোঁচায় আড়াই শত কমাইয়া দেওয়ায় অন্তত তাঁহার ক্ষেত্রে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অন্যান্য বিষয়ের নম্বর পূর্ব্ববৎ একরূপই রাখা হয়। সভাপতি ফিয়ার ভারতীয় যুবকদের এই পরীক্ষায় অধিক সংখ্যায় যোগদানের আবেদন জানান। তিনি বলেন, বিলাতের শিক্ষক ও পরীক্ষকদিগের নিকট হইতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না, এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার আছে। অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়। এইরূপে আলোচ্য বৎসরের কার্য্য শেষ হইল।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন

১৮৫৮ — ১৯২০

রথীন্দ্রনাথ রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে বিশিষ্ট কাব্যপ্রেরণা পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যের পথনির্দেশ করেছিল, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীই তাঁর ধ্যানতন্ময় ভাবাবিষ্ট মনের প্রাঙ্গণে তার অস্পষ্ট পদসঞ্চার অনুভব করেছিলেন। অবশ্য গীতিকাব্যের প্রেরণা ও সিদ্ধি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন নয়। কিন্তু বিহারীলাল সেই পুরাতন প্রেরণাকেই তাঁর আত্মভাবমগ্ন নবীন সাধনার দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন রূপে তুললেন। মধুসূদনও গীতিকবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু তার রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাঁর লিরিকের ভঙ্গিটি ছিল ধ্রুপদী। বিহারীলালের মতো তিনি ধ্যানশীল ও আবিষ্টচিত্ত ছিলেন না— তিনি ছিলেন আত্মসচেতন ও জাগ্রতচিত্ত। কিন্তু বিহারীলাল-প্রবর্তিত আত্মভাবমুগ্ধ কাব্যধারাটিই এই যুগের শক্তিশালী গীতিকবিদের পথনির্দেশ করেছে। বাংলা সাহিত্যে যে আখ্যায়িকাপ্রধান কাব্য একটি কৃত্রিম-ক্লাসিকপর্বের অস্পষ্ট সূচনা করেছিল, বিহারীলাল ও তাঁর অনুবর্তীদের নূতন ভাবসাধনায় তা ধীরে ধীরে তিরোহিত হল। রোমান্টিক গীতিকাব্যের অন্তর্মুখী ধারা রবীন্দ্রনাথের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন যে দুজন কবি বাংলা কাব্যের এই নবীন ভাবসাধনাকে তাঁদের কবিকৃতির মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশী জয়যুক্ত করেছিলেন, তাঁরা হলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবি অক্ষয়কুমার বড়াল।

রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বিহারীলালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য-কৈশোরের স্মৃতি-পর্যালোচনায় একাধিক স্থানে কবি বিহারীলালের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। বিহারীলালের মৃত্যুর পর লিখিত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটিতে (আধুনিক সাহিত্য) রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিমানসের মৌলিক অভিপ্রায়টিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু বিহারীলালের কবিকৃতিরই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন নি, তিনি তার সঙ্গে নিজের হৃদয়-অংশটুকুও যোগ করে দিয়েছেন। কারণ তিনি বিহারীলালের অন্তর্মুখী কাব্যাচরণটিকেই এক মহোত্তম বাণীমন্ত্রে ও কবিকল্পনার ঐশ্বর্যে জয়যুক্ত করে তুলেছেন। বিহারীলালের আর-এক মন্ত্রশিষ্য অক্ষয়কুমার তাঁর কাব্যগুরুর মৃত্যুর পর লিখেছিলেন :

বুঝায়েছ তুমি,—কত তুচ্ছ যশ ;
কবিতা চিন্ময়ী, চির সুধা-রস ;
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ
নারী কত মহীয়সী !

দেবেন্দ্রনাথ সেন

জন্ম ১৮৫৮ মৃত্যু ১৯২০

পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্‌-দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী !

এই শোকগাথার মধ্যে অক্ষয়কুমার শুধু বিহারীলালের প্রতি আবেগময় শ্রদ্ধাঞ্জলিই নিবেদন করেন নি, তিনি তাঁর কবিচরিতের বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নি। নিতান্ত কিশোর বয়সেই অক্ষয়কুমার ও রবীন্দ্রনাথ যেমন বিহারীলালের কাব্যের, এমন কি ভাষা-ছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন ঘটে নি। কর্মোপলক্ষে তিনি যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বাস করেছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁর কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয়। গাজিপুরে অবস্থানকালে তিনি তিনখানি ছোট কাব্য প্রকাশ করেন—'ফুলবালা' (১৮৮০), 'উর্মিলা-কাব্য' (১৮৮১) ও 'নির্ঝরিণী' (১৮৮১)। দেবেন্দ্রনাথের এই প্রথম তিনখানি কাব্য পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশী হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রীতি-পক্ষপাতের কথা উল্লেখ করেছেন :

'রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও উর্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার নির্ঝরিণী কাব্যের "আঁখির মিলন" কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ না থাকিলেও, পত্রের দ্বারায় পরিচয় ছিল। তিনি আমার উর্মিলা কাব্যের সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসান হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি" ইত্যাদি। গাজিপুরে অবস্থানকালে রবিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়।'[১]

দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ আছে। রবীন্দ্রনাথ তখন গাজিপুরে ছিলেন, অল্পসময়ের মধ্যেই এই দুই কবি আন্তরিক প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হন। গাজিপুরের সেই প্রীতিমুগ্ধ প্রহরগুলির কাহিনী শুনিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন প্রৌঢ় কবি—

'সে এক মহা-আনন্দের— আমার জীবনের দোলপূর্ণিমার দিন ছিল। নিত্য উৎসব, নিত্য পার্বণ! আমার অপ্রকাশিত কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতাম— তিনি আনন্দিত হইয়া শুনিতেন। তিনিও আপনার অপ্রকাশিত নূতন কবিতাগুলি আমাকে শুনাইতেন। আমি হর্ষবিহ্বল হইয়া শুনিতাম। তখনকার রবিবাবুর যেমন দেবকান্তি, তেমনই সুন্দর কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি। আমরা দুই জনে একপ্রকার Mutual Adulation Society করিয়া তুলিয়াছিলাম।'[২]

গাজিপুরেই রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথকে 'ভারতী' পত্রিকায় লিখতে অনুরোধ করেন। দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অবশ্য

১. স্মৃতি : ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

২. পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ

এ দুটি পত্রিকা ছাড়া তৎকালীন অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায়ও তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' (১৮৯৪) কাব্য 'কবিভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেনকে উৎসর্গ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁর 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২) কাব্যখানি 'সাহিত্য-সম্রাট' 'বন্ধুশ্রেষ্ঠ' রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে চিরদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পাঁচবছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবিভ্রাতা'র তিনটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।[৩]

২

দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের স্বরূপধর্ম নির্ণয় করতে হলে বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমারের কবিচরিতের মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে এর তুলনা করার প্রয়োজন। বিহারীলালের কাব্যের ভাব-বিভোরতা একটি মুগ্ধ-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি বলেছেন :

বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা—
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!

'বিচিত্র মত্তদশা' কিম্বা 'ভাবভরে যোগে বসা' বিহারীলাল বর্ণিত সাধনার স্বরূপ বর্ণনা মাত্র নয়, এগুলি কবির মানস-প্রকৃতির বিশেষণও বটে। বহির্বিশ্বের বস্তু অংশও অন্তরের এই ভাব-বিভোরতার রসে বিগলিত হয়ে বিহারীলালের ধ্যান-নিবিষ্ট চিত্তের স্বপ্নসাধ রচনা করেছে। এই অন্তরময় 'সুগভীর ভাবানুভূতি'ই কবিকে শেষ পর্যন্ত রহস্যরসের পথিক করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই রহস্যরস সাধনা ও মিষ্টিক ভাবানুভূতিই বিহারীলালের কাব্য-ফলশ্রুতি :

রহস্য মাধুরীমালা,
রহস্য রূপের ডালা,—
রহস্য স্বপন-বালা
খেলা করে মাথার ভিতরে
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে।
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

৩. অনুবাদ তিনটি ১৯১৬ সালে মডার্ন রিভিউ পত্রে মার্চ ও মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—"The Maiden's Smile", "My Offence" এবং "The Unnamed Child"। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের *Love 's Gift* (no. 21) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

উদ্ধৃত অংশটিকে বিহারীলালের কবি জীবনের চরম স্বীকৃতি বলা যায়। কবির কাছে এই 'রহস্য' লীলারসেরই নামান্তর। স্বচ্ছ সরোবরে যেমন চন্দ্রবিম্ব পড়ে, তেমনি কবিচিত্তেও এই রহস্যরসের লীলা চলে। এই লীলাই হল কবির ও যোগীর পরম সম্পদ। বিহারীলাল এই রহস্যরসের বিচিত্র লীলাকেই 'নেশার নয়নে' দেখতে চান—এর বেশী আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। এই অর্ধ-জাগর রহস্যধ্যান কবিচিত্তের একটি বিশেষ অবস্থা বটে, কিন্তু এই অবস্থাকে কাব্যের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত শিল্পরূপের দ্বারা মূর্ত করে তুলতে হয়। কিন্তু বিহারীলালের শিল্প সাধনা তত বড়ো ছিল না। তাই রহস্যধ্যান-বিভোরতার অস্পষ্ট গোধূলি লগ্নেই তাঁর কাব্যজীবনের নীরব পরিসমাপ্তি। বিহারীলালের ভাবসাধনা যেমন গভীর ছিল, শিল্পসাধনা তেমনি ছিল দুর্বল।

বিহারীলালের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৯৪) অক্ষয়কুমারের তিনটি কাব্য প্রকাশিত হয়—'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫), 'ভুল' (১৮৮৭)। 'প্রদীপ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বিহারীলালের মৃত্যুর এক বছর আগে (১৮৯৩)। বিহারীলালের মৃত্যুর পর বড়াল কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের আত্মিক সম্পর্কটি যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনি 'প্রেম কত ত্যাগী', 'নারী কত মহীয়সী', 'পূত ভাবোল্লাস', 'ভাষা কিবা গরীয়সী' প্রভৃতি অংশগুলির মধ্যে কবি নিজের অন্তর্জগতকেও উদ্ঘাটিত করেছেন। বিহারীলালের কবিশিষ্যদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের কাব্যজীবনের উপরেই তাঁর প্রভাব সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তবু বিহারীলালের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের একটি বড়ো পার্থক্য প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের কাব্যজীবনে প্রথম থেকেই যে-জাতীয় ভাব-বিভোরতা ছিল, অক্ষয়কুমারের কাব্যে তার স্বরূপ স্বতন্ত্র ধরনের। বিহারীলালের কবিমানস এত বেশী ভাব-বিভোর, যে সেখানে জাগ্রতচিত্ততা বা সতর্ক বিচার বুদ্ধির কোনো স্থান নেই। জাগ্রত বুদ্ধি ও সতর্কবিচারের উপলখণ্ডের নিম্নগহনে, ধীর মন্থর রহস্যরসের নির্জন উপকূলেই তাঁর মগ্নময় সাধনা। অক্ষয়কুমারের ভাবজীবনের মধ্যেও কখনো কখনো বিভোরতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় যে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ছিল, সেই অধ্যায়েরই একটি বিশিষ্ট অবস্থা হল এই আত্ম-বিভোরতা। কিন্তু অক্ষয়কুমারের মনে এই ভাবটি চিরস্থায়ী হয় নি, কারণ এই আত্মমগ্ন রসাবেশ একটু পরেই তিরোহিত হয়েছে :

> যা ছিল সকলি আছে, স্বপন টুটিয়া গেছে—
> আমি বুঝি আত্মহারা সই,
> যা নয়—তা ভেবে ভেবে—যা নই, তা হই।

বড়াল কবি তাঁর কাব্য গুরুর আত্মনিমগ্নতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তাঁর কবিচরিতে আর একটি দিকও ছিল। বিহারীলালের মতো ভাবাবেগের কৈবল্যই তাঁর ছিল না, তিনি ছিলেন বিহারীলালের তুলনায় অনেক বেশী আত্মসচেতন। সুমার্জিত ভাষা, বাগ্‌বিন্যাসের

গাঢ়তা, ভাস্কর্য-সুঠাম কাব্যরীতি অক্ষয়কুমারের কাব্যে এক সংযত সংহত 'ক্লাসিক আর্টের' গরিমা সঞ্চারিত করেছে।[৪]

বিহারীলাল ও তাঁর মন্ত্রশিষ্য অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের পার্থক্য কম নয়। বিহারীলালের কবিচিত্তের ধ্যানশীলতা দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় অনুপস্থিত, বিহারীলাল শেষ পর্যন্ত মিষ্টিক—কিন্তু মিষ্টিক সাধনা দেবেন্দ্রনাথের মনের অনুকূল ছিল না, বরং তিনি তার বিপরীত রসেরই সাধক ছিলেন। শিল্পসাধনায় তিনি ছিলেন অক্ষয়কুমারের সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। অক্ষয়কুমারের কাব্যরীতিতে যে সুমার্জিত ভাষা, যত্নকৃত বাগবিন্যাস ও গাঢ়বন্ধ কাব্যশ্রী আত্মপ্রকাশ করেছে, দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় তা একেবারেই নেই! এ কথা তাঁর কবিতার ভাবসম্পর্কে যেমন সত্য, প্রকাশরীতি সম্পর্কেও তেমনি সত্য। তাই দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের ক্রমবিকাশের সূত্র নির্ণয় করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার এমন কি সে যুগের কোনো কোনো অপ্রধান কবির কাব্যেও ক্রমবিকাশের সূত্র ধরে কবিমানসের মৌলিক অভিপ্রায় নির্ণয় করা সম্ভব। অবশ্য মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন: 'এ জন্য তাঁহার কবিজীবনের কালক্রম বা কবিশক্তির ক্রমবিকাশ তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যেই চিহ্নিত হইয়া আছে এবং চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে একটা ক্রমসূত্র পাওয়া যাইবে, এরূপ ধারণা অসংগত নহে; এতদ্ভিন্ন, প্রথম বয়সের রচনা, মধ্য বয়সের রচনা, ও শেষ বয়সের রচনা—এরূপ স্তরবিভাগে কোনও বাধা নাই!'[৫]

মোহিতলালের মন্তব্যটির মধ্যে 'চেষ্টা করিলে' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই কথাটির দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের ক্রমপরিণতির সূত্রটি আচ্ছন্নপ্রায়, কবিচরিতের অসম পদক্ষেপই তার কারণ। তাই তার মনের পরিণতি খানিকটা অনুমান ও অনেকখানি চেষ্টার দ্বারা বুঝে নিতে হয়। অক্ষয়কুমারের মানস-পরিণতির ইতিহাস তেমন নয়। তিনি শুধু কাব্যের বহিরঙ্গ-প্রসাধনেই সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন না, তাঁর কবিমানসের প্যাটার্নখানির মধ্যেই জীবনপরিণামের সুস্পষ্ট পথরেখা অঙ্কিত। এই তুলনামূলক আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথের মানস-বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়। আসল কথা, দেবেন্দ্রনাথের সব বয়সের কবিতাতেই অসম-পদবিক্ষেপ আছে অর্থাৎ একই সময় তিনি যেমন প্রথম শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন, তেমনি নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত কবিতাও লিখেছেন। এই বৈশিষ্ট্য শুধু দেবেন্দ্রনাথের কবিজীবনের বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কেই সত্য নয়—তাঁর প্রায় চল্লিশ বৎসরব্যাপী কবিজীবনেরও প্রকৃতি এই। এই কারণেই নিছক কাব্যোৎকর্ষের দিক

---

৪. 'অক্ষয়কুমারের কবিচিত্ত অনিয়ম অপেক্ষা নিয়মের, উচ্ছ্বাসের অবধি প্রাচুর্য অপেক্ষা সংযমের স্বল্পভাষী কঠিনতার পক্ষপাতী ছিল। এই হিসাবে তাঁহার কবিতাগুলিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের classic art-এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যাইতে পারে।'

—অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা, নানা নিবন্ধ: ড. সুশীলকুমার দে

৫. দেবেন্দ্রনাথ সেন: আধুনিক বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪০

থেকে দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের ক্রমপরিণতি নির্ণয় করা সহজ নয়। তাঁর ভাবোদ্বেল উচ্ছ্বসিত কবিমনের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য কম নয়। কিন্তু কবিকল্পনার অসংযম ও অধীর উৎকণ্ঠা তাঁকে যেমন প্রকৃতি ও নারী সম্পর্কে ইন্দ্রিয়সচেতন রূপপিপাসার বিমুগ্ধ শিল্পীতে পরিণত করেছে, তেমনি হৃদয়াবেগেই সেই দুর্জয় বন্যাই তাঁকে পথভ্রষ্ট করেছে। এই যুগের কোনো কবির কাব্যেই বোধ হয় কবিক্ষমতার এত বেশী অপচয় হয় নি। তাই বাংলা সাহিত্যের এই শক্তিমান রূপ-রসিক কবির কাব্যজগতে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, গত যুগের সেই উদ্যানটি আগাছা ও বন্য লতাপাতায় প্রায় দুর্ভেদ্য--কিন্তু তারই মধ্যে অশোকের রক্তরাগে, গোলাপের গন্ধ-বিলাসে, শেফালির শিশিরসিক্ত শুভ্রসৌন্দর্যে, পারিজাতগুচ্ছের স্বর্গীয় প্রভায় একটি অমর সৌন্দর্যস্বপ্ন প্রসারিত—'চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি—রূপের পূজারী।'

৩

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম তিনখানি কাব্যকে (ফুলবালা, উর্মিলা-কাব্য, নির্ঝরিণী) তাঁর কবিজীবনের ভূমিকা বলা যায়। এই তিনখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ যদিও তাঁর পরিণত শক্তির বাহন নয়, তবু এই অপরিণত কাব্য-কাকলির মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের কবিশক্তির দোষ গুণ দুইই বিদ্যমান। 'ফুলবালা' কাব্যখানি একটি পুষ্প-কবিতার সংকলন। রোমান্টিক যুগের ইংরেজী কাব্যে পুষ্প-কবিতার বিচিত্র সংকলন লক্ষ্য করা যায়। ফুলের বস্তুধর্মের আড়ালে তাঁরা একটি বিশেষ ভাবরূপকেই উদ্ঘাটিত করতেন! ওয়ার্ডসওয়ার্থের ফুলের কবিতাগুলিতে অতি সাধারণ উপেক্ষিত ফুলগুলির মধ্যে এক আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি ও প্রাত্যহিক জীবনে 'মানবের শিক্ষণীয় অনেক গুণ' আবিষ্কৃত হয়েছে। শেলীর ফুলের কবিতায় এক অপার্থিব অসীম ব্যঞ্জনা দ্যোতিত হয়েছে। ফুলের মধ্যেও মানবহৃদয়সুলভ সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা তিনি গীতি-মূর্ছনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে বৃহত্তর সৌন্দর্যলোকের সঙ্গে এর একটি অখণ্ড যোগসূত্র নির্ণয় করেছেন। কীট্‌সের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপপিপাসা ফুলগুলির বর্ণের দীপ্তিতে ও গন্ধের প্রগল্‌ভতায় এক অখণ্ড সৌন্দর্যরাজ্য সৃষ্টি করেছে।

দেবেন্দ্রনাথের 'ফুলবালা' কাব্যটিতে আঠারোটি ফুলের কবিতা আছে। সবগুলি ফুলই প্রকারান্তরে নারীচরিতের আলোচনা। ফুলের পুষ্পসত্তা কোথায়ও নেই বললেই চলে—সর্বত্রই নারীচরিতের এক-একটি দিক প্রকাশিত হয়েছে। 'কামিনী' ফুলের কথা বলতে গিয়ে তাঁর নারীর ক্ষণস্থায়ী যৌবনের কথা মনে হয়েছে :

হায় রে তোমারই মত নারীর যৌবন।
ভাল করি না ফুটিতে, সুসৌরভ না ছুটিতে,
স্মৃতি-দর্পণের তলে হয় রে পতন ;
তাই কি কৌশলে ছলে করাও স্মরণ ?

'সূর্যমুখী' কবিতায় কবি নারীপ্রেমের এক বিশ্ববিজয়িনী শক্তিকে দেখেছেন। 'প্রেম অতি মহাবল, প্রেমের অদ্ভুত বল'-ই সূর্যমুখীরূপিণী নারীসত্তার মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন :

এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে আজি
তপন-সুন্দরি !
নারী হয় প্রেমময়ী প্রেম তার বিশ্বজয়ী
ভূধর যদ্যপি টলে, টলে নাগো নারী ;
প্রেমে যাই বলিহারি !

দেবেন্দ্রনাথের ফুলের কবিতার মধ্যে ঐ যুগের নারীবন্দনা মন্ত্রই ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। ফুল তার বস্তু অংশ বর্জন করে এক একটি নারীচরিতের প্রতীকরূপিণী হয়ে উঠেছে। ফুলকে অবলম্বন করে হৃদয়ের কোনো সূক্ষ্ম গভীর সংবেদন এখানে লীলায়িত হয়ে ওঠে নি। আসল কথা, 'ফুলবালা' দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য, এখানে খুব গভীর ভাবও প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু একটি বিষয় এখানেও লক্ষ্য করা যায়ঃ কবিতাগুলির অবলম্বন ফুল, কিন্তু বিষয় হল নারী। এই দুটি বিষয় তাঁর কবি জীবনের সবাংশ অধিকার করে আছে।

'ঊর্মিলা-কাব্যে'র 'সীতার প্রতি ঊর্মিলা' কবিতাটিকে পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' (১৯১২) কাব্যের একটি প্রাথমিক খসড়া বলা যায়। কিন্তু এই কাব্যের আর একটি কবিতা দেবেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার নূতন সংকেত দেয়। 'ফুলবালাদিগের উক্তি' পরবর্তীকালে 'গোলাপ গুচ্ছ' কাব্যের অন্তর্ভু ক্ত হলেও কবিতাটি আসলে 'উর্মিলা-কাব্যে'রই। কবিতাটি পূর্ববর্তী কাব্যের চেয়ে কাব্যাংশে সার্থক। এখানকার ফুলবালাদের মধ্যে পুষ্পসত্তা ও নারীসত্তার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ফুলবালাদের আত্মকাহিনীতে পুরাণ, কালিদাস ও শেক্সপীয়রের প্রসঙ্গও এসে পড়েছে। ফুলবালাদের জগতেব সূক্ষ্ম সুরময় ঝঙ্কারকেও কবি শুনিয়েছেন :

দুর্বাদল-পরশিনী,
পরীর নূপুর-ধ্বনি
শুনাই মোদের কুঞ্জে, লুকায়ে নিভৃতে।
(অপরের অগোচর !)
নক্ষত্রের মনোহর,
কলকণ্ঠ গীতধ্বনি, শুনাই নিশীথে।

দেবেন্দ্রনাথের 'ফুলবালা' কাব্য ও 'ফুলবালাদিগের উক্তি' প্রসঙ্গে ররীন্দ্রনাথের 'শৈশব সঙ্গীত' (১৮৮৪) কাব্যটির কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। এই 'ফুলবালা' 'দিক্‌বালা' 'কামিনী ফুল', 'গোলাপ-বালা' 'ফুলের ধ্যান' প্রভৃতি কবিতায় ফুলের প্রসঙ্গ আছে। আছে। দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয় কবির পক্ষেই এ যুগটি একটি অবাস্তব স্বপ্ন-বিলাসের যুগ। অশরীরী বাসনার কুয়াশা মনের দিগন্তে যে অস্পষ্ট ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল, তাই জীবনাভিজ্ঞতাবর্জিত এই দুই কবির এই যুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। জীবন

সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার অভাবেই এই জাতীয় কবিতাগুলি একটি স্বপ্নাচ্ছন্ন। অবাস্তব-মনোহর জগতের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। অথচ 'ফুলবালা' জাতীয় কবিতাগুলি ঠিক প্রকৃতির কবিতাও নয়। প্রকৃতিচেতনার গভীরতাও নেই, আবার জীবনের অভিজ্ঞতাও নেই।—এ যুগের সব কিছুই রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত 'অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তি'।[৬] দেবেন্দ্রনাথের 'ফুলবালা'-পর্বের কাব্য সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য হতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথের এই উন্মেষ-পর্বের কাব্যত্রয়ীর সর্বশেষ কাব্য 'নির্ঝরিণী'তে অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর কবিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যেন 'ফুলবালা'-পর্ব অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন। এতদিন জীবন-অভিজ্ঞতাবর্জিত যে অশরীরী বাসনাগুলি নীহারিকার মতো কবির মনের দিগন্তে জেগে ছিল, এখন থেকে তা রূপ পেতে শুরু করেছে। এখন শুধু ফুলের জগৎ, চাঁদের আলো, অপ্সরীর চপল নৃত্য ও প্রাচীন কাব্য-রোমান্সের প্রেমোপাখ্যান-গুলির মধ্যেই কবি বিচরণ করেন না ;—জীবনের মধ্যে অভিজ্ঞতার রঙ্ মিশেছে। দাম্পত্য প্রণয়রসের যে কয়েকটি ছবি তিনি এঁকেছেন, তা তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কাব্যের 'আঁখির মিলন' কবিতাটি একসময় রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। দাম্পত্যজীবনের মিলন-মাধুর্যকেই কবি রূপ দিয়েছেন :

আঁখির মিলন ও যে—আঁখির মিলন।
লোকে না বুঝিল কিছু লোকে না জানিল কিছু
দম্পতীর হল তবু শত আলাপন!
হল মন জানাজানি হল মন-টানাটানি—
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন,
বিজয়ার কোলাকুলি— আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন-লেপন।

দেবেন্দ্রনাথ দাম্পত্যপ্রেমকেই নানা প্রসাধনে মণ্ডিত করেছেন। এই প্রসাধন-রচনায় বর্ণময়তা ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁর কবিমনের সূক্ষ্ম সুকুমার-সংবেদনও সোনালি রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। 'আশার চিকণ হাসি'—কাব্যাংশটি সেই মুগ্ধমনের একটি সার্থক স্বাক্ষর রেখেছে।

'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'ভালবেস না' কবিতাটি (পরবর্তীকালে এই কবিতাটি 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যে সংকলিত হয়) দেবেন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটি নিগূঢ় সংকেত বহন করে। তেরোটি স্তবকের বারোটিতেই কবি নারীপ্রেমে সংশয় প্রকাশ করেছেন—কুসুমের মধ্যে যে কীট থাকে এ কথা বলতেও তিনি ভোলেন নি। নানাভাবে তিনি নারীপ্রেমে সংশয় প্রকাশ করেছেন :

গোলাপে কণ্টক হয় বিধাতার খেলা রে,
অগ্নির বিকার মাত্র সুন্দরী চপলা রে ;

---

৬. **'যে-বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে,···সেই বয়সের কথা।'— জীবনস্মৃতি (১৩৫০ সংস্করণ), পৃ. ৯৪-৯৫**

রত্নের উত্তম যেই, উজ্জ্বল হীরক সেই,
অঙ্গার-বিকারমাত্র ; ভুল নারে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না।

বারোটি স্তবকের ভিতর দিয়ে যে ভাবটি উপমাদি অলংকারে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল, সর্বশেষ স্তবকের একটি স্বীকৃতিতে প্রেমনিয়তির রহস্য যেমন ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি দেবেন্দ্রনাথের কবিজীবনের অভিপ্রায়ও প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমিকের অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয় দিয়ে কবি প্রেমকে সংশয়দৃষ্টিতে দেখলেও আসলে প্রেমের চিরজয়ী সত্তারই বন্দনা করেছেন। তাই কবিতার শেষস্তবকে বলেছেন :

বৃথা বাণী! বৃথা বাণী! প্রেমান্ধ প্রেমিক রে!
তার কাছে "প্রেম" সত্য, কভু কি অলীক রে?
কভু নয়, কভু নয়! হে প্রেম, তোমারি জয়!
অমলা, ধবলা প্রিয়া, নহে কলঙ্কিনী রে!
চিরদিন সুখ-প্রসবিনী রে!

কবিতাটি পড়ে মনে হয় যে, কবির সংশয়-অভিমান চিরজয়ী প্রেমকেই উজ্জ্বলতর করে দেখানোর একটি কাব্য-কৌশল মাত্র।

দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতিও এই কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় চিত্র-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। দর্পণে প্রতিবিম্বিত সুন্দরীর রূপচ্ছবি কয়েকটি নির্বাচিত উপমায় রূপায়িত হয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকেই কবি উপমাদির প্রয়োগে চিত্ররূপ দিয়েছেন—এই চিত্রধর্মিতাই কবিতাটির প্রাণ :

চারু মুখপদ্ম ফুটিছে দর্পণে,
অধর-সংস্থিত বিরাজিছে তিল,
ভৃঙ্গ-শিশু যেন পদ্মপত্র-কোণে ;
গলদেশে আসি কৃষ্ণ কেশরাশি,
হরিদ্রাভ অঙ্গ চুম্বিছে সঘনে।
কৃষ্ণমেঘ যেন সুধাংশু-বদনে।

দেবেন্দ্রনাথের কবিজীবনের উদ্ভবলগ্নটির প্রারম্ভিক অধ্যায় 'ফুলবালা' পর্ব—ফুল-লতাপাতা-চাঁদ প্রভৃতি দিয়ে একটি জগৎ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। এ এক অবাস্তব মনোবিলাসের পর্ব। এখানকার ফুলগুলিও না প্রকৃতি, না মানুষ। এ জগতের মধ্যে জীবনসমুদ্রের দু-একটি লবণাম্বুকণিকাও উৎক্ষিপ্ত হয় নি। কিন্তু কবি ধীরে ধীরে জীবনের সমীপবর্তী হয়েছেন, জীবনের বাস্তব-অভিজ্ঞতার স্পর্শে কবিতাগুলিও নূতন রসে সঞ্জীবিত হয়েছে—'নির্ঝরিণী' কাব্যের কয়েকটি কবিতাই তার প্রমাণ। অস্পষ্ট মানস-বিলাসের যুগ ধীরে ধীরে কেটে গেল—জীবনরসের নূতন অধ্যায় প্রসারিত হল। 'উদ্ভব' পর্ব থেকে

কবি অগ্রসর হলেন 'সমৃদ্ধি' পর্বের দিকে! 'নির্ঝরিণী' কাব্যেই সেই জগতে কবির দ্বিধাজড়িত প্রথম পদক্ষেপ।

৪

দেবেন্দ্রকাব্যের 'সমৃদ্ধি'-পর্বের সর্বোত্তম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে (প্রথম সংস্করণ ১৯০০)।[৭] এই কাব্যটিতেই দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের অধীর উল্লাস এই কাব্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। নারীসৌন্দর্যের মোহিনীমায়ায় কবির এই বিহ্বলতা রূপৈশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে :

যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?
বিহ্বলা মোহিনী বেশে, কথা কস্ হেসে হেসে
জহুরির দোকানের পট খুলে যায়।
কোহিনূরে কোহিনূরে, আলো যে উথলি পড়ে!
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরায় মুক্তায় :

কবিহৃদয়ের অশান্ত রসাবেশ কোহিনূরের আলোকচ্ছটায়, ইন্দ্রনীল-হীরা-মুক্তার বর্ণ ও রূপজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে!

দেবেন্দ্রনাথের পিপাসাতুর দেহমনের উৎকণ্ঠা 'দাও দাও একটি চুম্বন' কবিতায় এক বন্ধনহীন দুর্বার উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছে। সমগ্র কবিতার মধ্যে যে রূপকরণ ও অলংকার আছে, তা এমনি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত যে, মনে হয় কবির তৃষাতুর মনেরই এক-একটি দুর্লভ স্পন্দন এক বিচিত্রচিত্রিত প্রবালদীপ্তিতে জ্বলে উঠেছে—এ দীপ্তি যেমন প্রগল্‌ভ তেমনি বর্ণময়। কিন্তু উচ্ছ্বাসের এই ফেনস্ফীত উদ্বেলতা যতই থাকুক-না কেন, দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের অন্তরঙ্গ রূপকেই অভ্রান্ত করে তুলেছে :

দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগরসঙ্গমে,

---

৭. ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের পরিণতি বিচারের পক্ষে এই দ্বিতীয় সংস্করণের তেমন প্রয়োজন নেই। কারণ এই সংস্করণে যেমন পূর্ববর্তী সংস্করণের এগারোটি কবিতা বর্জিত হয়েছে, তেমনি এগারোটি নূতন কবিতাও সংযোজিত হয়েছে। এমন কি প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থেরও কিছু কিছু কবিতা এখানে আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের 'অশোকগুচ্ছ' কাব্য কতকটা বিভিন্ন পর্বের কবিতার সংকলনজাতীয়। এইজন্য বর্তমান আলোচনায় অশোকগুচ্ছের প্রথম সংস্করণকেই অবলম্বন করা হয়েছে।

দুর্জয় বানের মুখে, ভাসাইয়া দিব সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

কবি 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন'কে 'দুর্জয় বানের মুখে' ভাসিয়ে দেওয়ার যথার্থ কবিভাষাও আয়ত্ত করেছেন। 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যের 'শেষ চুম্বন' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। এখানে পূর্ববর্তী কবিতার সেই দুর্বার হৃদয়াবেগ কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়ে এসেছে, কিন্তু কবির তৃষ্ণা তেমনি আছে। এই পিপাসা যে নিছক পিপাসাই নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু-একটি নির্বাচিত উপমায়। কবি তাঁর অমর পিপাসাকে সূর্যকান্ত মণি, প্রবাল ও কাঞ্চনের রূপৈশ্বর্যে মণ্ডিত করেছেন। প্রথম কবিতাটির দুর্জয় বন্যা এখানে মণিখণ্ডের নিটোল ও সংহত রূপের মধ্যে যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে :

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
সূর্যকান্ত মণি সম অধর-প্রবালে মম
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ!

'অশোকগুচ্ছ' কাব্যের আর-একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'নারীমঙ্গল'। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের একটি ইতিহাস আছে। এই কবিতায় কবি 'বঙ্গ-সুন্দরী'-কেই আরতি করেছেন। বঙ্গবধূর গার্হস্থ্য চিত্রকে এখানে বর্ণের আল্‌পনায় ও কল্পনার ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত করে তোলা হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসে বড়াল-কবির মতো কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবু প্রত্যহ ও প্রত্যক্ষের মধ্যেই তিনি কখনো কখনো 'বিশ্বের আকাশ'কে প্রতিবিম্বিত দেখেছেন :

বসি তব রূপকক্ষে বিশ্বের আকাশ
হেরি সখী, সীমাশূন্য সে নীলবিতানে
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ—
দেববৃন্দ, দেববধূ, আলোক-বিমানে।

কিন্তু এই সীমাশূন্য নীলবিতান দেবেন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকে বেশীক্ষণ উধাও করে রাখতে পারে নি, বঙ্গবধূর প্রণয়ের আকর্ষণ তাকে গার্হস্থ্যজীবনের প্রাঙ্গণে টেনে এনেছে :

হে মোহিনি শিক্ষাদাত্রি! তাই এ বন্ধন
মম অবন্ধন-মাঝে! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী
দিয়া আনিছ টানিয়া, ধন্য এ যতন!

কবির সেই মোহিনী শিক্ষাদাত্রীই তাঁর কল্পনা-অশ্বিনীর বাধাবন্ধহীন গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিকল্পনা আকাশ-বিহারের উল্লাসে কখনো কখনো সর্ববন্ধন অতিক্রম করেছে, কিন্তু কবির শিক্ষাদাত্রী সেই নারীলক্ষ্মীই তাকে শৃঙ্খলিত করেছে— দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই শৃঙ্খলই *শিঞ্জিনীতে* পরিণত হয়েছে। কারণ এই মধুর বন্ধন

কবিরও কাম্য। 'নারীমঙ্গল' কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' (সোনার তরী) কবিতাটির তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই দুই কবির কবিমানসের লক্ষ্য ও পরিণামের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। 'মানসসুন্দরী' কবিতায় কবির প্রেয়সী কখনো দুর্নিরীক্ষ্য ঊর্ধ্বলোকের নিঃসঙ্গ তারকা, আবার সেই তারা গৃহদীপের নম্র মাধুর্যে কবির জীবনকে সুন্দর করে তুলেছে। কবি একবার বলেছেন :

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি,
প্রণয়ে বিকাশি।

তার পরেই আবার বলেছেন :

বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তাব
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে— টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়—

'মানসসুন্দরী' কবিতায় 'সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালোবাসা' ও 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা'—দুটি সুরই বিদ্যমান। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায়ও এই দুটি সুর আছে, কিন্তু স্বরূপগত পার্থক্য অনেকখানি। 'সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা' বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝিয়েছেন (অন্তত মানসসুন্দরী কবিতায়) তা বাঙালীব গার্হস্থ্যজীবনেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র নয়, গৃহজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনায় তা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে নি। তাঁর মানসসুন্দরী এক মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্যলোকের অধিশ্বরী—বিশ্বপ্রকৃতির লাবণ্যতরঙ্গে তার ললিত যৌবনের বিস্তার। কবি এই বন্ধনহীন সৌন্দর্যকে যখন একান্ত আপন করে পেতে চান, তখনই প্রশ্ন জাগে—'পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি'। মানসসুন্দরী কবিতায় যদিও বলা হয়েছে—'কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।'—তবুও এ 'মূরতি' কখনো দেবেন্দ্রনাথের বঙ্গবধূদের মতো আটপৌরে শাড়ী পরে শ্বশুর-দেবরকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করেন না। দেবেন্দ্রনাথের কবিতাটিতে যাঁর ছবি আছে, তিনি স্বরূপতই বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের বধূ :

বধূর সুমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আ মরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি!—ত্যজি শাটী,
পড়ি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরী,
কোথা যাও, বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে!

পশিয়া রন্ধনগৃহে, তণ্ডুল ব্যঞ্জন
সুস্বাদু। রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে।

এ চিত্র 'মানসসুন্দরী' কবিতায় প্রত্যাশা করাই ভুল! দেবেন্দ্রনাথের 'বিশুদ্ধ গার্হস্থ্যরস' ও রবীন্দ্রনাথের 'সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা' যেমন একজাতীয় নয়, তেমনি এই দুই কবির সৌন্দর্যানুভূতিও স্বতন্ত্র প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যবাসনা যে দূরায়িত নিরুদ্দেশের মহা-উপকূলে স্বপ্ন-বাসর রচনা করে, দেবেন্দ্রনাথের কবিকল্পনার পক্ষে তা সম্পূর্ণ অনায়ত্ত—কারণ গৃহজীবনের অজস্র সম্পর্কবন্ধনে তা শতপাকে জড়িত। তাই তাঁর 'কল্পনা-অশ্বিনী'ও পক্ষীরাজ নয়, মেঘলোকে উধাও হওয়ার মতো তার পাখা নেই—এ অশ্বিনী প্রাত্যহিক জীবনেরই গৃহপালিত। তার গতি আছে, কিন্তু সে গতি মর্ত্যলোকের, মেঘলোকের নয়।

৫

অশোকগুচ্ছের 'আমি কে?' কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাতে তার কবিচরিতের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে :

গ্রামের এ কূলে কূলে, প্রাণের অশ্বত্থ-মূলে
যতদিন বহিবে জাহ্নবী—
খোকারে লইয়া বুকে,
প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে,
বুক পুরি' রঞ্জিব এ ছবি—
ক্ষুদ্র আমি বাঙ্গালার কবি!

দেবেন্দ্রনাথ মুক্তপথ কল্পনায় ঊর্ধ্ববিহারের কথা বলেন নি, 'মেঘচুম্বিত অস্তগিরির সাগরতলে' উত্তীর্ণ হওয়ার আশ্বাসও দেন নি—তিনি এক প্রীতিমুগ্ধ গার্হস্থ্যজীবনকেই হৃদয়রাগে রঞ্জিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের কাব্যে এই স্নেহপ্রীতি সমুজ্জ্বল গার্হস্থ্যরস নানা মূর্তিতে রূপায়িত হয়েছে। এই গার্হস্থ্যরসের কবিতাও দুটি প্রধান ধারায় অভিব্যক্ত দাম্পত্যপ্রেমের কবিতা ও বাৎসল্যরসের কবিতা। কখনো কখনো আবার পারিবারিক জীবনের অন্যান্য অংশের উপরও আলোকপাত করেছে। 'আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী', 'ডায়মনকাটা মল' প্রভৃতি কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের ভাষা ও কল্পনা চাতুরীর প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু দাম্পত্যরসের কবিতাগুলির মধ্যে কবির রূপোল্লাস অশোকের রক্তরাগে প্রবালের দীপ্তিতে বিলসিত হয়েছে। প্রেমের হাব-ভাব, লীলা-চাতুরী, চুম্বন-আলিঙ্গন প্রভৃতি রূপবৈচিত্র্যগুলি দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাণময় হয়ে উঠেছে। দাম্পত্যরসের মধ্যেই প্রেমের

মূলমন্ত্রটি তিনি পেয়েছেন। এ যুগের কবিরা সকলেই প্রায় এই মন্ত্রেরই পূজারী। তবু তার মধ্যেও প্রকারভেদ আছে বই কি?

দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই প্রকারভেদটি কি? দাম্পত্যপ্রীতিরসের সঙ্গে যৌবনস্বপ্ন ও রূপোল্লাস দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এক ত্রিবেণীতীর্থ রচনা করেছে। দাম্পত্যপ্রীতিরস যৌবনস্বপ্নের সুখাবেশে কেমন বর্ণবিচিত্র ও লীলাচতুর হতে পারে তার একটি উদাহরণ:

কে আনিল আলোরাশি হৃদয়-আঁধারে?
অধরের ফাঁক দিয়া;
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া,
দম্পতীর শয্যার আগারে!
রঙ্গীন বারনীস্ পেয়ে, খাটপালা হেসে উঠে!
কে রে এ চতুর কারিগর?
দেয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হল!
কে রে সুনিপুণ চিত্রকর?
কনক-পারদ লেগে, মলিন দর্পণখানি
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর!

এই শ্রেণীর কবিতায় বর্ণের বিভ্রম ও লীলার চাতুরী আছে, কিন্তু তবু এই জাতীয় কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের চূড়ান্ত পরিচয় বহন করে না। কারণ লীলার উচ্ছলতাই এর সবটুকু, সে লীলাও কবির কাব্য-কৌতূহলের শফরীনৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। দেবেন্দ্রনাথ এর চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছিলেন; তাই এই-জাতীয় কবিতাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার দ্যোতক মনে করা সংগত হবে না।

দেবেন্দ্রনাথ যৌবনস্বপ্ন ও রূপোল্লাসের কবি। তাঁর নিজের অধিকারটুকুর মধ্যে যেখানে যৌবনস্বপ্ন ও রূপোল্লাস গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে, সেখানেই তিনি কবিহিসেবে সবচেয়ে বেশী সার্থক হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের রূপোল্লাসের একটি সার্থক কবিতা হিসেবে 'দীপহস্তে যুবতী' কবিতাটি উদ্ধার করা যাক:

"ছাড় ছাড়; হাত ছাড়—"
ছাড়িলাম হাত,
হে সুন্দরী রোষ কেন? তুমি যে আমার
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আঁধার?
তোমাতে আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ!
তরুটি ভরিয়া গেছে, অশোকে অশোকে,
বসেছে জোনাকি-পাতি কুসুমে কুসুমে!
কবিচিত্ত ভরি গেল মাধুরী-আলোকে,
তুমি সখি তরু হতে নেমে এলে ভূমে!

কি অশোক-বার্তা আনি' মরমে মরমে
ঢালি দিলে কবিকর্ণে অশোক-সুন্দরী !
দিবসের পাপ-চিন্তা কলুষ সরমে
হেরি ও সাঁঝের দীপ গিয়াছে বিস্মরি' ?
হাসিয়া ছাড়ায়ে হাত গেল বধূ ছুটি—
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি।

কবিতাটিতে কবির গার্হস্থ্য-চেতনা তেমন পরিস্ফুট নয়, এক 'বধূ' শব্দটি ছাড়া দাম্পত্য-সম্পর্কের ছায়াও এখানে নেই—কবির সৌন্দর্যমুগ্ধতা এখানে আরো নিঃসংশয়ভাবে ধরা দিয়েছে—'প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি।'

দেবেন্দ্রনাথের বাৎসল্যরসের অধিকাংশ কবিতাই 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' কাব্যে সংকলিত হয়েছে। গার্হস্থ্য-চেতনার একটি সুর যেমন তাঁর দাম্পত্যপ্রীতির কবিতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি বাৎসল্যরসের কবিতা আর-একটি সুরকেই পূর্ণ করে তুলেছে। এই দুই শ্রেণীর কবিতার প্রকৃতিগত পার্থক্য বেশী নয়, অনায়াসেই একটি সুর থেকে আর-একটি সুরে যাতায়াত চলে। এই যুগের কবিদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল বাৎসল্যরসের কবিতা রচনায় খ্যাতিলাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যও এই পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের বাৎসল্যরসের কবিতার সঙ্গে স্ত্রীবিয়োগের বেদনাও মিশ্রিত আছে। মাতৃহারা পুত্রকন্যাদের প্রাত্যহিক সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে পত্নীবিরহের অশ্রুধৌত মহিমা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের বাৎসল্যরসের কবিতায় এই সুরটি অনুপস্থিত। পূর্বোল্লিখিত কবিদের মতো দেবেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত পত্নীবিয়োগের অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় নি। তাই তাঁর বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি তুলনামূলকভাবে অনেকখানি নিষ্প্রভ—যেন একমেটে মাটির সাজ ; স্ত্রীবিয়োগের বিরহভাস্বর স্বর্ণরশ্মি কবিতাগুলিকে দ্বিজত্বের মহিমা দেয় নি।

সহজ-মুগ্ধতা ও রূপোল্লাস যেখানে অবিমিশ্রভাবে কবিহৃদয়ের সূক্ষ্মতর সংবেদনকে লীলায়িত করে তুলেছে, দেবেন্দ্রনাথের কবিশক্তি সেইখানেই চূড়ান্তশীর্ষে আরোহণ করেছে। তাঁর প্রকৃতি-সম্পর্কিত কবিতার মধ্যেও ইন্দ্রিয়সচেতন রূপ-সুখোল্লাস স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। বর্ণের গাঢ়তায়, রেখার স্পষ্টতায়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের উৎসব-বিলাসে দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই স্বরূপত চিত্রধর্মী। পরিচিত বর্ণের কত বিচিত্র বিভাগ তিনি করেছেন ! অশোকের রক্তরাগ বর্ণনায় কবিহৃদয়ের বর্ণপিপাসা যেন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় নি—গোপিনীর আবীর কুঙ্কুম থেকে মদন-বধূর অধরের কোণ পর্যন্ত সর্বত্র কবি লাল রঙের অনুসন্ধান করেছেন :

কোথায় সিন্দূর গাঢ়—সধবার ধন ?
আবীরকুঙ্কুম কোথা গোপিনী-বাঞ্ছিত ?
কোথায় সুরীর কণ্ঠ আরক্তবরণ ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ লোহিতে রঞ্জিত ?

কোথায় বা ভাঙে-রাঙা রুদ্রের লোচন ?
কোথা গিরিরাজ-পদ অলক্তে মণ্ডিত ?
মদন-বধূর কোথা অধরের কোণ—
ব্রীড়ার বিক্ষেপে হায় সতত লোহিত ?

অশোক ফুলের 'গাঢ় ও তরল' রূপের উপমা চয়ন করতে গিয়ে কবিমনের বর্ণমুগ্ধতাই প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একসময় কাদম্বরী কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাণভট্টের যে বর্ণবিলাস প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, তা দেবেন্দ্রনাথের এইজাতীয় কবিতাগুলি প্রসঙ্গে আংশিকভাবে প্রযোজ্য। দেবেন্দ্রনাথের বর্ণগাঢতার প্রতি এই সতৃষ্ণ আকর্ষণ তাঁর রূপোল্লাসেরই একটি উপকরণ—তাই এই রঙ কোথায়ও আতিশয্যে পরিণত হয় নি। যদি কোথায়ও আতিশয্য থাকেও তা হলে তা বর্ণের নয়, হৃদয়াবেগের।

দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে 'রূপের পূজারী' বলেছেন। এখানে রূপ অর্থ শুধু সৌন্দর্যই নয়। কারণ যে সৌন্দর্য অতীন্দ্রিয়, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, দেবেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কখনো তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে নি। এখানে 'রূপ' শব্দটি এর বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারা যায়, এ রূপ-চেতনা 'সাকারে জড়িত', 'নিরাকারের অভিমুখী' নয়। বাধাবন্ধহীন বিমূর্ত (abstract) সৌন্দর্য কোনদিনই তাঁকে প্রলুব্ধ করে নি। 'বর্ষা'র কবিতায়ও তাঁর মন দিগ্‌দিগন্তে অভিসার করে নি—প্রকৃতির বহিরাশ্রয়ী বর্ণপ্রগল্‌ভ পুষ্পলাবণ্যই তাকে রূপসৃষ্টিতে তৎপর করে তুলেছে। মূর্তিরচনা করেই কবির আনন্দ :

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ওই রূপসী ?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে !
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ করি,
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝর্ঝরি।

দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার প্রসঙ্গে কীটসের সৌন্দর্যদৃষ্টির কথা মোহিতলালের মনে হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি এই দুই কবির সৌন্দর্যদৃষ্টির পার্থক্যটিকেও নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : 'কীট্‌সের সৌন্দর্য-পিপাসা অতি প্রখর বস্তুজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রাকৃতিক বস্তুসকলের রূপ, রং, রেখা, গতি ও স্থিতির ভঙ্গি, এ সকলই আশ্চর্যরূপে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, তাঁহার ইন্দ্রিয়চেতনায় কেবল ভোগবিলাস বা ভাবস্বপ্ন ছিল না, অতি-নিপুণ জ্ঞান-ক্রিয়াও ছিল।… কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। তাঁহার কল্পনায় তীব্র মাদকতা ছিল, সজ্ঞানতা ছিল না ; তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম ভাবাবেগ-বিহ্বল, বস্তুজ্ঞান-বিমুখ ; তাহাতে চেতনা অপেক্ষা মোহই অধিক।'[৮]

৮. আধুনিক বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৬২-১৬৩

কীট্‌স তাঁর সুবিখ্যাত 'ওড্ অন্ এ গ্রিসিয়ান আর্ন' কবিতায় বলেছেন :

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter ; therefore, ye soft pipes, play on ;
Not to the sensual ear, but more endear'd,
Pipe to the spirit ditties of no tone.

কীট্‌সকে সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপচেতনার কবি বলা হয়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে (Sensuous·beauty) পূর্ণতর মহিমা দেওয়ার জন্য তিনি এক বৃহত্তর সত্যের কল্পনা করেছেন। তাই কীট্‌সীয় সৌন্দর্যানুভূতি শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকেই রূপে রসে মহিমান্বিত করে নি, এর পিছনে আর একটি বৃহত্তর জগতের পটভূমি আছে,—এই প্রত্যয়ই তাঁকে অশ্রুত সঙ্গীতের মধুরতর আস্বাদনে পিপাসী করে তুলেছে।[৯] এই কবিতায় কীট্‌স তাঁর সৌন্দর্যদর্শনের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকৃতি তাঁর সৃজনীকল্পনারই (Creative Imagination) একটি গূঢ় অভিপ্রায়কে সূচিত করেছে। দেবেন্দ্রনাথের রূপোল্লাস প্রসঙ্গে কীটসীয় রূপদৃষ্টির কথা উত্থাপিত হওয়াই উচিত নয়। কারণ দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে যা একটি মুগ্ধতা ও উল্লাস মাত্র, কীট্‌সের পক্ষে তা কল্পবৃত্তির উৎসসন্ধানী দিব্যদৃষ্টি। কীট্‌সকে তাই ক্রমশ অন্তর্মুখী ও লক্ষ্যভেদী হতে হয়েছে। ফুলের বর্ণ ও ফলের রসোচ্ছল নিটোলতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু সেই 'রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে'ই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন নি। মর্ত্যের রূপজগতকে যেমন তিনি মোহময় করে তুলেছেন, তেমনি অবসাদ, অকালমৃত্যু, মোহভঙ্গ প্রভৃতির প্রতি অনুযোগও তাঁর সৌন্দর্যচেতনার উপর বিষণ্ণতার নীলাভ-সুন্দর ছায়াবিস্তার করেছে। দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যমোহ, মুগ্ধতার সীমাস্বর্গেই আবদ্ধ—কিন্তু সেই দৃশ্যমান রূপজগতের চারদিকে যে অশ্রুতসঙ্গীতময় জ্যোতির্লোক আছে, তার কোনো ক্ষীণ আভাসও তাঁর কবিতায় নেই। তাঁর কবিতা রূপোল্লাসের পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নি—অধীর ভাবোৎকণ্ঠার উদ্দাম তরঙ্গ ভাব-স্থির উপলব্ধির স্ফটিকদর্পণে পরিণত হয় নি। সৌন্দর্যের গভীর রহস্য উদ্ঘাটনের শক্তি তাঁর ছিলনা, কারণ তাঁর কবিচেতনায় সৃজনী কল্পনার সেই সৃষ্টিরহস্যভেদকারী খরদীপ্তি ছিল না। কোনো দ্বন্দ্ব-সংশয়, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের দিকে চেয়ে অপরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত।

---

৯. 'The truth is that in his conception of this unheard music Keats expresses with great force something which lies close to the centre of all truly creative experience. Great as was his physical sensiblity and his appreciation of everything that came through his senses, he knew in the moment of enjoying it that it was not everything and not enough. Anything so vivid and yet so transient must be related so some larger reality which, being permanent and complete, gives a satisfying basis to it.

—C. M. Bowra, ***The Romantic Imagination***, p, 141,

দৃশ্যমান প্রকৃতি ও গার্হস্থ্যজীবনের সুখতৃপ্তি, তাঁর কবিচিত্তে যে মোহাবেশের সৃষ্টি করেছিল, তাকে সবটুকু উৎকণ্ঠা ও আবেগোচ্ছ্বাস নিঃশেষ করে দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের ব্যর্থতা-সার্থকতা ঐটুকু ঘিরেই। কীট্‌সের মতো তিনি মর্ত্যলোকের সৌন্দর্যের সঙ্গে অসীম সৌন্দর্যলোককে এক স্বর্ণযোগসূত্রে আবদ্ধ করেন নি।—সে কবিশক্তি তাঁর ছিল না।

৬

দেবেন্দ্রনাথের কাব্য-যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বেই তার কবিপ্রতিভার ক্লান্তি ও অবসাদ লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজেও যে এ বিষয় সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জব্বলপুরে অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

'আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, অকপটভাবে তাহার উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আপনারা কি এখন আমার কবিত্বশক্তির হ্রাসপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিতেছেন? কোন কোন মাসিক পত্রিকা যেন সেইরকম কথা বলিতেছে। আমি অবশ্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ নহি। কারণ আমাদের গণ্ডারের চামড়া, ওরকম সমালোচনায় গায়ে একটি আঁচড়ও পড়ে না। সে যাই হউক, আপনার আন্তরিক মত কি, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব।'[১০]

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এই পরিণতিকে কোনোমতেই আকস্মিক বলা যায় না। শেষজীবনে তিনি ভক্তির কবিতা লিখেছেন, সাময়িক বিষয় ও কোনো কোনো ব্যক্তিকে অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। কাব্য হিসেবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির খুব বেশী মূল্য নেই। কবিকল্পনার সেই প্রমত্ত উৎসবলীলা আর নেই। ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত শীর্ণধারা ভক্তিরসকে আশ্রয় করেছে। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিবর্তন আকস্মিক মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর কবিপ্রকৃতির দিক থেকে এই প্রকার পরিণতি নিতান্ত আকস্মিক নয়। কাব্যজীবনের প্রথম থেকেই দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রীতিমুগ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রীতিই রূপোল্লাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর কবিজীবনকে সার্থক করে তুলেছিল। ঐ রূপোল্লাসের অনেকখানিই যৌবনস্বপ্ন থেকে উদ্ভূত। তাই যৌবনজোয়ার যখন ভাঁটার টানে অনেকখানি প্রশমিত হল, তখন রূপোল্লাসেরও সেই বেগ আর রইল না, প্রীতিমুগ্ধতাই তার চেয়ে বড় হয়ে উঠল। এই প্রীতিরই স্বাভাবিক পরিণতি ভক্তিরস। তাই দেবেন্দ্রনাথের শেষজীবনের কবিতায় ভক্তিরই আধিপত্য, সৌন্দর্যবোধ সেখানে ক্লান্ত। দেবেন্দ্রনাথ ক্ষণবসন্তের কবি—যৌবনস্বপ্নমদির বিশেষ ঋতুটিই তাঁর কাব্যে পুষ্পাভরণে

১০. দেবেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৪৫, পৃ. ১৮-১৯ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলসিত। সেই স্বপ্ন যখন ফিকে হয়ে আসে তখন একমাত্র প্রীতিকে সম্বল করে ভক্তিরসের কবিতা রচনা করাই সম্ভব। একদা যৌবনোদ্বেল রূপ-তরঙ্গিণীর প্রবল বন্যায় এই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি তাঁর 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন'কে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আজ সে উদ্বেলতা নেই,—চাতুর্য ও মাধুর্যের মহোৎসব নেই—শুষ্ক নদীর বুকে কবির অসহায় চিত্তের শীর্ণ আকিঞ্চনটুকু মাত্র আছে। সেইটুকুকেই ভক্তির রসে বিগলিত করে এই 'ছিন্নকণ্ঠ পিক্' সান্ত্বনা পেতে চান :

আমার প্রতিভা আজি কাঙ্গালিনী, হে শ্যামসুন্দর
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে
নহে আর ; মাধবী-মণ্ডপ তার মধুপে মধুপে
নহে আর ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত ! শুষ্ক সরোবর,—
ফোটে না ফোটে না তথা একটিও পদ্ম মনোহর
উপমার ; ঝরি গেছে লতা-পাতা ; ওই দীনস্তূপে
ক্রোটনের পাতা কাঁপে, (হায় রে তারে কে করে আদর ?)
কম্বল-সম্বল-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চুপে !
হে বঁধু, হে প্রাণেশ্বর ! নাহি খেদ নাহি তাহে লাজ ;
তুমি যবে আসিয়াছ, কিবা কাজ গোলাপী ভূষণে ?
যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী ভুলি তুচ্ছ সাজ,
আলুথালু কেশ-পাশ—পড়ে নাকি রাতুল চরণে ?
জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না ঘৃণা,—
পতিচক্ষে, প্রাণনাথ ! প্রবীণা যে সুচির-নবীনা।

কবির এই স্বীকৃতিই তাঁর কবিজীবনের চরমতম ফলশ্রুতি !

৭

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের মানসিকতা ও কাব্যচরণের দিক থেকে দুটি ধারা লক্ষণীয়। এর প্রথমটি হল কৃত্রিম-ক্লাসিক কাব্যাদর্শ, আর দ্বিতীয়টি হল রোমান্টিক ভাবাদর্শ। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে পূর্ণাঙ্গ ক্লাসিক্যাল যুগ গড়ে ওঠে নি। একমাত্র মধুসূদনই তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে মিল্টনীয় সমুন্নতি ও ক্লাসিক ভাবাদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চারিত করেছিলেন। মধুসূদনের অনুকারীদের মধ্যে এক জাতীয় কৃত্রিম ক্লাসিক ভাবাদর্শের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের কাব্যসাধনা এই ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সার্থক প্রতিবাদ। ধীরে ধীরে এই ধারা একটি অন্তর্মুখী রোমান্টিক ধারার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় রোমান্টিক ধারারই জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে।

মধুসূদনের পরে কাব্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের প্রভাব খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের কেউ কেউ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' প্রথমভাগে হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে অনেকখানি, সামান্যকিছু নবীনচন্দ্রের প্রভাবও আছে। কামিনী রায় যে শুধু তাঁর কাব্যের ভূমিকা হেমচন্দ্রের দ্বারা লিখিয়েছিলেন তাই নয়, অনেককাল পর্যন্ত তিনি হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মধুসূদনের সঙ্গে আত্মীয়তাসম্পর্ক মানকুমারীকে 'বীরকুমারবধ কাব্য রচয়িত্রী' করে তুলেছিল। এই কমপ্লেক্স থেকে তিনি কোনোদিনই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেন নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনাও মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যের দ্বারা কোনো কোনো অংশে প্রভাবিত হয়েছে।[১১]

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে বলেছেন: '···সে বহুকালের কথা। আমি হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের কবিতা মুখস্থ করিতাম, নিজেও খুব কবিতা লিখিতাম, কোন নূতন সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম।'[১২] অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তকে তিনি বলেছিলেন: —'দেখুন, আমি পুরাতন 'স্কুলের'—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি। এই রবীন্দ্রের যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত। ' ' ' আমার কিন্তু সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। সে যাহাই হউক, মাইকেলই আমার গুরু।'[১৩]

দেবেন্দ্রনাথের এই দুটি স্বীকারোক্তি তাঁর কবিপ্রকৃতি বিচারের একটি মূলসূত্র। মধুসূদনের কাব্যরীতির প্রভাব তাঁর কবিতার অনেক জায়গায়ই আছে। 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' ও 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' কাব্যদুটিতে মধুসূদনীয় কাব্যপরিকল্পনার প্রভাব আছে। কিন্তু সে প্রভাব বেশীর ভাগই বহিরঙ্গগত। তাঁর কাব্যে মধুসূদনীয় বাগ্‌ভঙ্গিও অনেক আছে।[১৪] দেবেন্দ্রনাথের প্রথম তিনখানি কাব্যের প্রকৃতিকবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত ব্যঙ্গাত্মক বাগ্‌ভঙ্গিও হেমচন্দ্রের ঐ শ্রেণীর কবিতাকে স্মরণ করিয়ে

---

১১. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন রচিত 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০।

১২. স্মৃতি : ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ. ১৬২

১৩. দেবেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৪৫, পৃ. ২০: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪. 'সমাসোক্তি (personification) এবং সম্বোধন (apostrophe) দেবেন্দ্রনাথের কাব্যপদ্ধতির নিজস্ব রীতি। এ বিষয়ে মধুসূদন ইঁহার গুরু। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পয়ারে এবং অন্যত্রও parenthesis-এর ব্যবহারে দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনের অনুসরণ করিয়াছেন।'

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০, পৃ. ৫২৫: ড. সুকুমার সেন।

দেয়। তবু দেবেন্দ্রনাথকে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের ধারার কবি মনে করাও সংগত হবে না। তিনি যেমন একদিকে বাংলাকাব্যের ক্রমবিলীয়মান অধ্যায়টির শেষরশ্মি পান করেছেন, তেমনি বাংলা কাব্যের আর-এক দিগন্ত যে অসাধারণ কবিকল্পনার দীপ্তরাগে রঞ্জিত হয়েছিল, তাকেও তিনি প্রাণভরে অভিনন্দন জানিয়েছেন :

নববলয়িতা লতা বালিকা-যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর-পরশে—
লাজে বাধ' বাধ' বাণী, রূপের আলসে
ঢল ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন !
পাঠ করি', সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে !

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার রহস্যরসেও তিনি অবগাহন করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সনেটগুলি মধুসূদনের আদর্শে রচিত হয় নি, তিনি প্রধানত 'কড়ি ও কোমল'-এর রূপাদর্শের ধারাই প্রভাবিত হয়েছেন। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ--দুই যুগের দুই কবিপ্রতিনিধি দেবেন্দ্রনাথকে সমভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। একজন তাঁর রতি, আর একজন আরতি। মধুসূদনের কাব্যভূমিতে বসেই তিনি রবীন্দ্র-আরতি করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-বরণের জন্য কিছুকালের জন্য সেই অতি প্রিয় কাব্যভূমিকেও ছাড়তে হয়েছিল—সেইখানেই শুধু ক্ষণকালের জন্য তাঁর কবিকল্পনা পঞ্চেন্দ্রিয়ের রূপ-বিলাসে মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর বীরাঙ্গনা-ব্রজাঙ্গনার কবির রূপাদর্শে তিনি ফিরে এসেছেন। কিন্তু কল্পনার ধারা তখন শুষ্কপ্রায়— সেইটুকু দিয়েই তিনি ভক্তিঅর্ঘ্যরচনার শেষ চেষ্টা করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনও নন, রবীন্দ্রনাথও নন। কিন্তু এই দুই মহাকবির কাব্যজগতের মাঝখানে যে সংকীর্ণ ভূখণ্ড ছিল দেবেন্দ্রনাথ তারই অধিবাসী--'ক্ষুদ্র এক বাঙ্গালার কবি।' দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের এই স্বরূপটি সে যুগের বাংলাকাব্যের একটি স্বল্পস্থায়ী মিশ্রমানসের পরিচয় বহন করে। এই হিসেবে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা বিশিষ্ট।

জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিকী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাহিত্য পরিষদের সহিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তাহা হয়ত অনেকেরই অজ্ঞাত। বৈজ্ঞানিক হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত, এবং তাঁহার বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাই অধিকতর পরিচিত ; কিন্তু তাঁহার সহজ সাহিত্যবোধ ও পরিষদের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ তাঁহার মননশীলতার আর-একটি দিকের পরিচয় বহন করে। জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনার অধিকাংশই ১৩২৮ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে ; গ্রন্থের নামকরণই তাঁহার সাহিত্যপ্রবণ কল্পনার নির্দ্দেশক। ইহা ছাড়া, প্রকাশিত চিঠিপত্রের মধ্যেও তাঁহার বাংলা রচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বাংলা সাহিত্যের সহিত জগদীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ সংযোগ হইয়াছিল ১৩১৮ সাল হইতে, যে সময় তিনি ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কেবল বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা নয়, এই নির্ব্বাচনের মূলে ছিল ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা। তাঁহার প্রথম সুপরিচিত নিবন্ধ 'দাসী' পত্রিকায় এপ্রিল ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত 'ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে'। এই সময়ে তাঁহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা, 'যুক্তকর', 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ', 'অগ্নিপরীক্ষা' ও 'গাছের কথা'। কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্যপরিবেশনে নয়, রচনা-নৈপুণ্যেও এই প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্মেলনের সভাপতি হইয়া তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাঁহারও উপযুক্ত প্রতিপাদ্য ছিল 'বিজ্ঞানে সাহিত্য'।

নিজস্ব গবেষণার ফল প্রচারের জন্য জগদীশচন্দ্রকে বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। চতুর্থবার বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁহাকে ডি. এস্-সি উপাধি ভূষিত করে, তখন (৫ই শ্রাবণ, ১৩২২ সালে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সান্ধ্যসম্মিলন আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। ইহার পর বৎসর, ১৩২৩ সালে, পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া ১৩২৫ সাল পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি পরিষদকে গৌরবান্বিত করেন। এই সময় পরিষদে 'নবীন ও প্রবীণ' এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার অভিভাষণে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার প্রাজ্ঞতা, ধীর-শান্ত নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই বিরোধ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছিল, এবং পরিষদের কার্য্যক্রমে শৃঙ্খলা আসিয়াছিল। ১৩২৪ সালে তৎকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও মনীষীদের সহযোগিতায় তিনি পরিষদে নানা বিষয়ে ভাষণাবলীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; এবং নিজেও আলোকচিত্রের সাহায্যে 'আহত উদ্ভিদ' সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাত্মক একটি বিষয়ের সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

পুনর্ব্বার বিদেশগমন ও নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁহাকে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু পরিষদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-সূত্র কোনও দিন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যশোমণ্ডিত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর ১৩২৭ সালে পরিষদ্ তাঁহাকে সোনার দোয়াত-কলম উপহার দিয়া, এবং পুনরায় ১৩৩৪ সালে তাঁহার সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে অভিনন্দনপত্র দিয়া সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। দেহান্তের পরে, তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উন্নতির জন্য তিন হাজার টাকা দান করিয়া পরিষদে একটি স্মৃতি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষদের প্রতি জগদীশচন্দ্রের মমত্ববোধের ইহা একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

দেশ-বিদেশে অভিনব গবেষণার প্রচারের জন্য তাহাকে বিদেশী ভাষাতেই লিখিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার স্বল্পসংখ্যক বাংলা রচনা সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার স্বদেশ ও স্ব-ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের। বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিভাষিক শব্দ আছে, সুতরাং লেখা দুষ্কর নয়; কিন্তু বাংলায় উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অভাবে গবেষণাত্মক বিষয় সহজবোধ্য ও মনোগ্রাহী করিতে হইলে বৈজ্ঞানিকের যে ভাষাজ্ঞান ও রচনানৈপুণ্যের প্রয়োজন তাহা জগদীশচন্দ্র সহজেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্যগুলি স্বচ্ছ ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার যে অসাধারণ শক্তি তাঁহার বাংলা রচনায় আমরা দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার শিক্ষিত মনের সহজাত সাহিত্যবোধ হইতেই বিকাশলাভ করিয়াছিল। শব্দপ্রয়োগে দক্ষতা আছে, কিন্তু আড়ম্বর নাই, প্রকাশভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু কৃত্রিমতা নাই। নিছক সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার সময় বা অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না; কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিতে কেবল বৈজ্ঞানিকের নয়, সাহিত্যিকেরও অপূর্ব্ব পরিচয় রহিয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

তীর্থযাত্রী

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ঋষি এবং কবি প্রায় সমানার্থবাচক শব্দ। যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা, যাঁহার নিকট প্রকৃতি বা বিশ্বভুবনের মর্ম অনাবৃত হয়, তিনিই ঋষি, তিনিই কবি। বর্তমান জগতে অন্যান্য বিদ্যা অপেক্ষা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ জগৎবাসীর নিকটে বিজ্ঞান অঘটনঘটনপটীয়সী বিদ্যার আকারে সমাদর লাভ করিলেও প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের নিকটের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সমাদর সম্পূর্ণ অন্য কারণে ঘটিয়া থাকে। মানুষ নানা উপায়ে সত্য লাভ করিয়া থাকে; তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্তমান জগতে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানী বস্তুজ্ঞানের উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করেন, এবং সেই জ্ঞান তিনি বহুবিধ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার সহায়তায় সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে তথ্যের সংগ্রহমাত্র বিজ্ঞান নহে। এমন-কি সংগ্রহের মূলেও যদি সজাগ মন এবং তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তির প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তথ্য সংগ্রহের কর্ম ইষ্টকস্তূপ সংগ্রহের মত নিরর্থক হইতে পারে। উৎকৃষ্ট বহু ইষ্টক সংগ্রহ করিলেই তাহা মন্দির হয় না, মন্দিরের গঠন স্বতন্ত্র; অবশ্য উৎকৃষ্ট মন্দির নির্মাণের জন্য উৎকৃষ্ট ইষ্টকেরও প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত ভূমিকা নিবেদন করিবার কারণ হইল, বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে এক প্রকার দুর্বল মনোভাব আমাদের ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবনের উচ্চতম স্তরে পর্যন্ত যেন কায়েমী হইয়া বসিয়া আছে। স্বাধীনতা অর্জনের পরেও যেন তাহা ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহিতেছে না। ইউরোপ বা আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকগণ সমাজের নানা জীবন্ত সমস্যা লইয়া পর্যালোচনা করেন। শিল্পে, বাণিজ্যে, মনুষ্যসমাজে বহুবিধ সমস্যার উদয় ঘটিয়া থাকে, ঐ সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইহার যথাযথ সমাধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন প্রকৃতির গভীরতর সমস্যার উদ্‌ঘাটনে যাঁহারা রত, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মৌলিক জিজ্ঞাসাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। বর্তমান কালে ইউরোপের বহু স্থানে এবং আমেরিকায় পাখীর ভাষা, মৌমাছির ভাষা প্রভৃতি লইয়া যেমন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গবেষণাকার্য আরম্ভ হইয়াছে, তেমনই মানুষের মনের গূঢ় ক্রিয়াদির বিষয়েও অভিনব উপায়ে নিরীক্ষণ বা পরীক্ষাদির সূচনা দেখা দিয়াছে। ফলে নূতন নূতন অপ্রত্যাশিত সত্যের অধিকার লাভ ঘটিতেছে।

অভাগা ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহই যে মৌলিক, স্বাধীন প্রশ্নের অবতারণা বা পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভব করেন নাই, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে ইহা সত্য তাঁহাদের সংখ্যা ইউরোপের তুলনায় অসম্ভব রকমের অল্প বলিয়া মনে হয়। ভারতের বাহিরে অপর দেশে কোথায় কে কি কাজের দ্বারা সুনাম

অর্জন করিয়াছে, তাহারই ভারতীয় সংস্করণ বা পুনরাবৃত্তির যত নমুনা দেখা যায়, তাহার পর্বতস্তূপের অন্তরালে মৌলিক গবেষণা প্রায় অদৃশ্য হইয়া থাকে।

বহুদিনের পরাধীন দেশে এরূপ অনুকরণপ্রিয়তা বা দাসসুলভ মনোভাবের অস্তিত্ব একান্ত অস্বাভাবিক নহে। বিজ্ঞানে যে অনুকরণের স্থান নাই তাহাও নহে; বস্তুতঃ একই পরীক্ষা পৃথিবীর নানা স্থানে, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর দ্বারা অনুসৃত হইলে তবেই আমরা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু যে কথা আমাদের বারংবার স্মরণ রাখা কর্তব্য তাহা এই যে, বিজ্ঞানী নিজের পারিপার্শ্বিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। এবং যদি কোনও সমস্যা জীবনের সুর হইতে উদ্ভূত না হইয়া থাকে, তবে তাহার সমাধান বহুক্ষেত্রে নিষ্ফল অনুকরণে পর্যবসিত হয়।

মানুষের মুক্তি হয় মনে। এবং মুক্ত অথবা মুক্তিকামী মন লইয়া যখন বিজ্ঞানসেবী নিজের চারিপার্শ্ব পর্যবেক্ষণ করেন তখন তাহার মনে হয়তো এমনই সকল প্রশ্নের উদয় হয় যাহার উত্তর সন্ধান করিতে গিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্পূর্ণ নূতন দুয়ার উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন। আমাদের দেশে যে স্বল্পসংখ্যক বৈজ্ঞানিক এই পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

তিনি প্রথমে পদার্থবিদ্যা অধিকার করেন। কিন্তু সেই পদার্থবিদ্যার মধ্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গতি সম্বন্ধে এমন সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, এবং তাহার উত্তর সংগ্রহ করিতে গিয়া এমন বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিলেন যে এক দিক দিয়া বলিতে গেলে জগতের প্রথম বেতার বার্তাবহ যন্ত্র তাহারই উদ্ভাবনী শক্তির বশে নির্মিত হইল।

বিজ্ঞানে যাঁহারা উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, এমন কি জীববিদ্যা প্রভৃতির মত আপাততঃ পৃথক শাস্ত্রের ব্যবধান উত্তরোত্তর ঘুচিয়া যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের দ্বারা উদ্ভিদ এবং প্রাণী, এমন কি জীব এবং জড়ের মধ্যে সীমারেখা সত্যসত্যই নির্ধারণ করা যায় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকজন সুদক্ষ বাঙালী কারিগরের সাহায্যে তিনি এমনই সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করিতে সমর্থ হইলেন, যাহার দ্বারা উদ্ভিদের জীবনের গতি বা 'হৃদয়-স্পন্দন' আমাদের নিকট আলোক রেখার গতির আকারে, বা উদ্ভিদের নিজের লিখিত বিন্দুসমষ্টির রূপ ধরিয়া হস্তলিপির মত প্রতিভাত হইল।

যন্ত্রের উদ্ভাবনে তাঁহার যেমন মৌলিকতা দেখা যায়, চিন্তার রাজ্যে ভয়শূন্য মনে নূতন নূতন দুঃসাধ্য বা প্রায় অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেও তাঁহাকে তেমনই লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। মনে উত্থিত কোন প্রশ্নকেই তিনি হেলায় ফেলিয়া দিতে চাহিতেন না; দুর্গম পথে নূতনতর সন্ধানে যাত্রা করা তাঁহার নিকট যেন চিত্তের আমোদ জোগাইত।

বৈজ্ঞানিকের জাতি নাই, ইহাই সচরাচর আমাদের ধারণা। কিন্তু বিজ্ঞানীও তো মানুষ, এবং যাহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "স্থানীয়তা" বলিয়াছিলেন, সেই স্থানীয়তা গুণ

বৈজ্ঞানিকের মনকেও যে সমৃদ্ধ করিতে পারে, ইহা মনে না করিবার কোনও হেতু নাই। যে জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যার মত সংস্কারবিহীন শাস্ত্রের সাধনায় রত ছিলেন, তাঁহার আরও একটি দিক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। এবং ইঁহারা দুইজনে ভারতীয় সংস্কৃতির যে-দুই বিশিষ্ট স্রোতধারাতে অবগাহন করিয়াছিলেন, জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গগুণেই হউক, অথবা স্বীয় স্বাধীন ভারতপ্রেমের বশেই হউক, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সেই বহুমুখী স্রোতধারায় অবগাহন করিয়া শুদ্ধ, সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। উপনিষদে যে বাণী মুখরিত হইয়াছে, যাহার মূল তত্ত্ব হইল ইহাই যে 'সেই একই বহু হইয়াছেন', জগদীশচন্দ্র স্বীয় বিজ্ঞানসাধনার মধ্যে নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা জড়ে ও জীবে, উদ্ভিদে এবং প্রাণীজগতে তাহারই সত্যতা স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজ্ঞান "স্থানীয়তা" গুণে সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিল।

ইহার অর্থ এরূপ নহে যে আচার্য জগদীশচন্দ্র সত্যকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জড় ও জীবের সম্পর্কে, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিষয়ে এমন-সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন যাহার মৌলিকতা বিস্ময়কর, এবং যে-কারণে তাঁহাকে ইউরোপের বিজ্ঞানজগৎ দ্রুত সম্মানের আসন দান করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

ভারতীয় সংস্কৃতির যে গূঢ়তত্ত্বে জগদীশচন্দ্র অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সঞ্চয়ের একটি উপায় তাঁহার ছিল তীর্থদর্শন। যৌবনে বিবাহের কিছুকাল পর হইতেই তিনি ভারতের তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে উত্তরোত্তর তাঁহার অন্তরে গভীর হইতে গভীরতর উপলব্ধি এই "স্থানীয়তা" গুণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়।

মানুষকে তিনি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। হয়তো সেই কারণে প্রকৃতি তাঁহার নিকট অপরাপর সকল তীর্থ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিল। কাশ্মীর অথবা নৈনীতালের পর্বত ও হিম নদী দর্শন অথবা মায়াবতী বা কেদার-বদরীর যাত্রা তাঁহাকে যে-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহার তুলনা হয় না। আচার্যের হৃদয়মন্দিরে হিমালয়ের জন্য একটি পবিত্রতম স্থান নির্দিষ্ট ছিল। দার্জিলিঙেই হউক অথবা অন্যত্রই হউক, তিনি এক একবার প্রকৃতির রূপে, তাহার বিশালতায় অবগাহন করিয়া চিত্তের মধ্যে প্রশান্তি লাভ করিয়া আসিতেন।

কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, নানা-ভাষাভাষী, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে অগণিত তীর্থযাত্রী একই সৌন্দর্য ও একই মন্ত্রের আকর্ষণে কেদার-বদরীর পথে চলিয়া প্রবাহশীল এক অবিভক্ত নরস্রোতের যে-আকার ধারণ করে, সেই মানবতীর্থ প্রকৃতির প্রিয়রূপ ভাগীরথীর মতই আচার্যের নিকট অপর এক আধ্যাত্মিক লোকের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দিত। সমগ্র ভারতবর্ষ সমগ্রতার বা অখণ্ডতার রূপ লইয়া এক নূতনভাবে তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিত।

মানুষের প্রতি আকর্ষণের মূলে জগদীশচন্দ্রের মনে অবস্থিত মানবীয়তার ভাবও অনেকাংশে দায়ী। হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক আচারের ভারে মানবীয়তা বহুলাংশে নিষ্পেষিত হইয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আমরা তাহা শুদ্ধতর এবং স্পষ্টতররূপে অবলোকন করিতে পারি। বুদ্ধের করুণা এবং মৈত্রী, তাঁহার সত্যলাভের জন্য দুর্জয় তপস্যার আকর্ষণ যত সহজে মানুষের চিত্তকে স্পর্শ করে হিন্দুধর্মের মরমীয়া সাধনা তত সহজে সাধারণ মানুষের চিত্তকে হয়তো আকর্ষণ করে না। আচার্য জগদীশচন্দ্র শুধু যে বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের ভূমি বজ্রাসনের অধিষ্ঠান বুদ্ধগয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা নহে, যে রাজগৃহের সহিত বুদ্ধের জীবনকাহিনী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেখানেও গমন করিয়াছিলেন।

হিন্দুর পূজা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংঘ বলিতে বৌদ্ধধর্মে যাহা বুঝায়, উত্তরকালে হিন্দুধর্মের সংগঠনে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান রচিত হইলেও বৌদ্ধ ইতিহাসেই তাহার সমধিক প্রকাশ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পশ্চিমাঞ্চলে কার্লি, অজন্তা, কেনহেরি প্রভৃতি স্থানেও যেমন আচার্যদেব আকৃষ্ট হন, বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলা বা নালন্দার প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ তেমনই সহজবোধ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। ভগবান বুদ্ধের ধর্মসংগঠনের আকর্ষণে জগদীশচন্দ্র বিভিন্নকালে সাঁচি হইতে সিংহল পর্যন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন।

সংস্কারকামী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে গুরুনানক এবং শিখধর্মও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিহারে অবস্থিত গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান যেমন তিনি দর্শন করেন, তেমনই লাহোর ও অমৃতসরে গমন করিয়া অন্যান্য শিখগুরুগণের দ্বারা পবিত্রীকৃত ভূমিও তিনি স্পর্শ করিয়া আসেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কারবাদী হইয়াও আচার্য জগদীশচন্দ্র হিন্দুধর্মের মন্দিরকে উপেক্ষা করেন নাই। পুরী, কোণারক বা ভুবনেশ্বরে অথবা বোম্বাই শহরের অনতিদূরবর্তী এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে অবস্থিত অপরূপ ভাস্কর্য এবং ইলোরার স্থাপত্য হয়তো শুধু শিল্পগুণেই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু অন্যান্য এমন বহু তীর্থেই তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন যেখানে তাঁহার সংস্কারবাদী শিক্ষিত আধুনিক মন কুসংস্কার বা আচারের আতিশয্যে হয়তো বিরক্ত হইবারই কথা। নর্মদাতীরে মান্ধাতায় ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে নিজের সৌন্দর্য বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু স্থানটি পরম রমণীয়। কিন্তু তাঞ্জোর, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি স্থানের সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। মন্দির এ-সকল স্থানে সুন্দর সন্দেহ নাই; কিন্তু অলঙ্কারের আতিশয্যে সেগুলি এমনই ভারাক্রান্ত যে স্পর্শকাতর মন লইয়া সেখানে রসোপভোগ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অথচ বিভিন্ন কালে আচার্য জগদীশচন্দ্র এ-সকল তীর্থদর্শনও করিয়া আসিয়াছিলেন।

বিচিত্র এই যে, আচার্যের মন হয়তো এমনই উচ্চকোটিতে আরোহণ করিয়াছিল, ভারতের মাটি ও মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ তাঁহার চিত্তে এমনই এক প্রেমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তিনি কুসংস্কারের স্তূপের দ্বারা পরাহত হইয়া ভারতীয় সাধনার

অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। পাংশুর দ্বারা আবৃত কাষ্ঠখণ্ড হইতে ধূম উত্থিত হইলে যেমন অন্তর্নিহিত অগ্নির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়, ভারতের হিন্দুমন্দির ও তীর্থের মধ্যে জগদীশচন্দ্র হয়তো তেমনই সত্যপদার্থের অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন। এবং সেইজন্যই অবহেলায় বা অনাদরে সেগুলিকে পরিহার করিয়া, শুধু শিল্পরসের সন্ধানও করেন নাই।

কথিত আছে, শ্রীরঙ্গমের মন্দির দর্শনকালে পুরোহিতগণ যখন তাঁহাকে বিমানের অভ্যন্তরে, গম্ভীরায়, মূল মূর্তি দর্শনের জন্য আহ্বান করেন তখন জগদীশচন্দ্র তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, তিনি সনাতনী হিন্দু নহেন, সংস্কারপন্থী হওয়ায় নিষিদ্ধ আচারের দ্বারা তিনি নিয়মলঙ্ঘনও করিয়াছেন। উত্তরে পুরোহিতগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মন্দিরের গম্ভীরায় প্রবেশ করিতে বাধা নাই, কেননা তিনি তো সাধু বা সন্ন্যাসী-শ্রেণীর লোক।

পুরোহিতেরা ঠিকই চিনিয়াছিলেন। যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের শাসনকে স্বীয় কাব্য-শক্তির দ্বারা বা ঋষিজনোচিত দৃষ্টিশক্তির বশে গভীরতর ও উজ্জ্বলতর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনিই স্বীয় "স্থানীয়তা"কে বা ভারতপ্রেমকে আশ্রয় করিয়া আনুষ্ঠানিক সর্ববিধ গণ্ডী এমনভাবেই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে অবশেষে ভারতের প্রচলিত ভাষায় "অনিকেতন" সন্ন্যাসীর ভূমিতে আরোহণ করেন, যখন স্থান এবং কালের ব্যবধান নিরাকৃত হইয়া তাঁহাকে প্রেমে সর্বমানবের সহিত এক অখণ্ডসূত্রে গ্রথিত করিয়া দেয়। তাহাই আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনার সর্বোচ্চ বিভূতি লাভের প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।

নির্মলকুমার বসু

জগদীশচন্দ্রের রচনা

মনস্বিতার একটি লক্ষণ এই যে তা এক মহৎ জীবনদর্শনে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। এখানে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের পথ একই। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে করতে পদার্থের অতীত এমন এক অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের সন্ধান পেয়েছিলেন যে-জগৎ কবির জগৎ ও সাহিত্যিকের জগৎ বলেই সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে। কবিও সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্তরের ঐক্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই জগদীশচন্দ্র তাঁর 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' প্রবন্ধে বলতে পেরেছিলেন, "বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।"

কিন্তু কেবল কবিজনোচিত দার্শনিকতা নয়, তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এমন একটি গুণ আছে, যা তাদের সাহিত্যরূপে চিহ্নিত করেছে। অবশ্য জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনার সংখ্যা অত্যল্প। একখানি মাত্র গ্রন্থ, 'অব্যক্ত', তাঁর রচনার নিদর্শনরূপে বর্তমান। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-কৃতিত্বের সাক্ষীরূপে আমার মনে হয়, তাঁর পত্রাবলীকেও গণনা করা উচিত। কেননা, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে কেবল যে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, সেগুলির মধ্যে তাঁর বাংলা রচনায় এমন একটি সহজ সারল্য ও অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, যা গদ্যলেখক মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত।

সত্য বটে, জগদীশচন্দ্র বাল্যাবধি সাহিত্য-সাধনা করেন নি। সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের দুরূহ দুর্জ্ঞেয় বহু জিজ্ঞাসায় তাঁর মন এমন পরিপূর্ণ হয়েছিল যে, সাহিত্যরচনার অবকাশ তিনি খুব অল্পই পেয়েছেন। তবু তাঁর 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে যে সাহিত্য-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনার যোগ্য।

সাহিত্যের বিশেষ চর্চা না করেও জগদীশচন্দ্র তাঁর রচনায় যে কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন, তা কেবলমাত্র আন্তরিক প্রেরণা দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। এ-প্রেরণাও তাঁর প্রতিভারই আর একটি লক্ষণ। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'হাজির'-এ জগদীশচন্দ্র নিজেই এ-প্রেরণার কথা বলেছেন :

"এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে।··· কোনদিন লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞায় 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম।"

'অব্যক্ত' কুড়িটি প্রবন্ধের সমষ্টি। তার মধ্যে প্রথমটি অবতারণিকা-স্বরূপ, ছয়টি প্রবন্ধ

বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা, দুটি উক্তি দ্‌-জীবন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এবং একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য। 'মন্ত্রের সাধন,' 'বোধন', 'মনন ও করণ' ও 'দীক্ষা' প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানের দুরূহ সাধনায় নিষ্ক্রিয় বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণাময় প্রবন্ধ। 'হাজির' প্রবন্ধটির উল্লেখ পূর্বেই করেছি। বাকি পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি এক ঐতিহাসিক বীরত্বের বিবরণ, দুটি সাহিত্য-সম্মিলনী ও সাহিত্য-পরিষদে পঠিত সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা, একটি বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে জগদীশচন্দ্রের নিবেদন ও একটি ভারতীয় নারীর সহজাত মহত্ত্ব ও বর্তমানে নারীর দুর্দশা সম্বন্ধে গভীর সমবেদনাময় ক্ষুদ্র রচনা।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রীতির একটি অন্তঃসলিল প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। পরাধীনতার গ্লানি, তৎকালীন বাংলা ও বাঙালীর অবনত অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা এবং ভগ্নোদ্যম অলস বাঙালী যুবককে বৃহত্তর কর্মে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণা জগদীশচন্দ্রের সকল প্রবন্ধেরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তৎকালীন মনীষীমাত্রই এই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, কেননা এ-কথা তখন তাঁরা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে স্বাধীনতা ভিন্ন প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হতে পারে না।

এই দেশপ্রেম এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস জগদীশচন্দ্রের সকল রচনায় সুস্পষ্ট। যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি কি শুধু পদার্থজগতের বাইরের রূপই দেখেন? এই বস্তুজগতের অন্তরালে জীবনের যে গভীরতর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন তা কি কেবল দার্শনিক ও কবিরই উপলব্ধ? ভাবের দিক থেকে জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এই দুই সত্তার যে মিলন সাধিত হয়েছিল, তা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে'র মধ্যে প্রকট। এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কিন্তু পড়বার সময় যে-কোনো পাঠকের পক্ষে এটিকে ভাবব্যঞ্জনাময় সাহিত্যপ্রবন্ধ বলে ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক।

"নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূম্ররাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীব্যাপিনী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

"শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।"

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন, তাকে সাহিত্য-রূপে পরিবেশন করার ক্ষমতা জগদীশচন্দ্রের ছিল বলেই তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে রচনা-সৌন্দর্যের জন্যও আমরা শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারি না।

'অব্যক্ত' গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিই বস্তুতঃ জগদীশচন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন

করে। 'সাহিত্য'-পত্রিকায় প্রকাশিত 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' আর একটি প্রবন্ধ যা ভাষার স্বচ্ছতায়, প্রকাশের ঋজুতায় ও অলংকরণে সাহিত্যরূপে গণ্য হবার যোগ্য।

"এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এ মুহূর্তে যাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান নদীস্রোত যেরূপ উপলখণ্ডকে বার বার ভাঙ্গিয়া অনবরত তাহাকে নূতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তি-স্রোতও সেইরূপ দৃশ্যজগৎকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিরাম নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই।...

"সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।"

উপরের উদ্ধৃতিটি কেবলমাত্র বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বব্যাখ্যা নয়, এখানে বিজ্ঞান সাহিত্য ও দর্শন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

'মুকুল'-এ প্রকাশিত ছোটদের জন্য সহজ ভাষায় যে বিজ্ঞানালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যেও জগদীশচন্দ্রের রচনা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া, তাঁর রচনা যে তিনি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি; ইতিহাস, নারীর মহিমা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়েই প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাতেই মনে হয় যে তাঁর রচনায় সাহিত্যগুণ তো ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনেরও একটি সাহিত্যিক দৃষ্টি ও সাহিত্যিক ঔদার্য ছিল যা বিজ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ছিল না।

যে সৌন্দর্য ও রসোপলব্ধি সাহিত্য রচনার প্রেরণাস্বরূপ এবং মনের যে বিশেষ গঠন কবিকে কবি ও শিল্পীকে শিল্পী করে তোলে, জগদীশচন্দ্রের তা সহজাত ছিল। সে জন্য বিজ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন থেকেও এই অসাধারণ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের রচনার মহত্ত্ব বহু তথাকথিত সাহিত্যিক ও সমঝদারের আগেই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই ভিন্নপথচারী বন্ধুর সাহিত্য-সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় জানতেন বলেই নিজের সকল রচনা এঁকে না দেখিয়ে তৃপ্তি পেতেন না। বিলাত-প্রবাস-কালে কর্মব্যস্ত জগদীশচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা কী আনন্দ, কী প্রেরণা বহন করে নিয়ে যেত, জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীতে তার বহু পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য জগদীশচন্দ্রের আগ্রহ ছিল কী গভীর! একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখছেন, "যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হয় তাহাদিগকে করুণার পাত্র মনে করি। আর যাঁহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্বচন কি আপনার নিকট পৌঁছে না? আমি ত কখন কখন আপনার ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়া যাই। কোন কোন স্বর শুনিয়া মনে হয়, এ কি একজনের কথা, না, এই দুঃখসুখময় সময়ের অগণিত অশান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস?" আর একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে

আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এ দেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না।...এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে কেবল জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি নয়, তাঁর রচনার আন্তরিকতা এবং সহজ সাবলীল ভঙ্গিটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতের নিশ্ছিদ্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলোই ছিল তাঁর আনন্দ ও প্রেরণাস্বরূপ, এ কথা জগদীশচন্দ্রের চিঠি পত্রে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্রের অন্তরের যোগ সাহিত্যের সঙ্গে কত নিবিড় ছিল, এই চিঠিপত্রগুলি তার নিদর্শন।

জগদীশচন্দ্রের কর্মময় জীবন ও রচনা আলোচনা করলে তাঁর তিনটি প্রধান আকর্ষণ অতি স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি—বিজ্ঞান, স্বদেশ ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম, অতি গভীর ভালোবাসা। বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি আজন্মকাল বহু দুঃখ ও অশান্তি সহ্য করেছেন, সত্য অন্বেষণে ব্যাঘাত ঘটবে আশঙ্কা করে যিনি ক্রোরপতি ব্যবসাদারের কাছে বহু মূল্যেও তাঁর যন্ত্রের পেটেণ্ট বিক্রি করতে সম্মত হন নি, তাঁর বিজ্ঞান-প্রেমের কথা আলোচনা করা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু তাঁর তীব্র স্বদেশপ্রেম ও সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় তাঁর রচনাগুলি না পড়লে পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করা যায় না। কি তাঁর চিঠিপত্রে, কি তাঁর রচনায় ও অভিভাষণগুলিতে, এক দিকে যেমন তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম জাজ্বল্যমান্, অপর দিকে তেমনই তার সাহিত্য-প্রীতি ও রচনার সৌন্দর্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত।

মনের যে বিশেষ গঠন, ভাব ও ভাবনার যে বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা, ভাষার উপর যে সহজ প্রভুত্ব সাহিত্যিককে সাহিত্যিক করে তোলে, তার কোনোটারই অভাব জগদীশচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু তিনি সাহিত্যের সেবা অপেক্ষা বিজ্ঞানের সাধনাকেই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। তবু, সেই অক্লান্ত সাধনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমাদের জন্য যতটুকু সাহিত্য পরিবেশন করে গিয়েছেন, তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অজিত দত্ত

জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা-সূচী

পুস্তিকা ও গ্রন্থ

সভাপতির অভিভাষণ। পৃ ১৪, পরিশিষ্ট [/•]। Printed by Pulin Bihari Das from "Debakinandan Press", 66 Manicktola Street, Calcutta.

আখ্যাপত্র বা লেখকের নাম নাই।

১৩২৪ সালের ৫ই চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে পরিষৎ-সভাপতি জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক পঠিত। "শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। এই অধিবেশন সেই অভিভাষণ পাঠের জন্য আহূত হইয়াছিল।"

এই পুস্তিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্বিংশ ভাগের চতুর্থ সংখ্যার (১৩২৪) ক্রোড়পত্র-রূপে অন্তর্ভুক্ত। জগদীশচন্দ্রের অব্যক্ত গ্রন্থে "নবীন ও প্রবীণ" নামে এই অভিভাষণ পুনর্মুদ্রিত, সাময়িক বিবরণ পরিবর্জিত।

অব্যক্ত। আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, এফ্, আর, এস্। মূল্য ২৷৹। পৃ [।৴৹], ২৩৪ প্রকাশ-তারিখ আশ্বিন ১৩২৮। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

সূচী :

যুক্তকর ॥

আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ ॥ সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০২

গাছের কথা ॥ মুকুল, আষাঢ় ১৩০২

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু ॥ মুকুল, ভাদ্র ১৩০২

মন্ত্রের সাধন ॥ মুকুল, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩০৫

অদৃশ্য আলোক ॥

পলাতক তুফান ॥ কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৩

অগ্নিপরীক্ষা ॥ দাসী, মে ১৮৯৫

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে ॥ দাসী, এপ্রিল ১৮৯৫

বিজ্ঞানে সাহিত্য ॥ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮

নির্ব্বাক জীবন ॥

নবীন ও প্রবীণ ॥ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্বিংশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা (১৩২৪) : ক্রোড়পত্র, 'সভাপতির অভিভাষণ'

বোধন ॥ প্রবাসী, মাঘ ১৩২২

মনন ও করণ ॥

বাণী-সন্দর্শন ॥ ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৮

নিবেদন ॥ নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ ; প্রবাসী, পৌষ ১৩২৪

দীক্ষা ॥

আহত উদ্ভিদ ॥ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৬

স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ ॥

হাজির ॥ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৮

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-কর্তৃক এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়—বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী তারিখ ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৮। বহু বৎসর পরে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-কর্তৃক এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয় (১৩৫৮ ও ১৩৬৪)। এই গ্রন্থের জগদীশচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ যন্ত্রস্থ। অব্যক্ত প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর ১৩২৯ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে 'বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী' নামে জগদীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি অব্যক্তের জগদীশচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণভুক্ত হইবে এরূপ জানিয়াছি।

নবীন ও প্রবীণ ব্যতীত, অব্যক্ত গ্রন্থে সংকলিত আরও কোনও কোনও রচনা পূর্বে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে এরূপ অনুমানের কারণ আছে, যথা বিজ্ঞানে সাহিত্য, ও নিবেদন। এগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' অভিভাষণের একটি ইংরেজি রূপও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল—

LITERATURE AND SCIENCE. Substance of the Presidential Address given by the anthor in Bengali at the Literary Conference at Mymensingh, April 14, 1911. Pp. 16. [8 May 1911].

প্রবন্ধাবলী। *বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী বসু। ১৩৪০। প্রকাশক* **শ্রীমতী শকুন্তলা** দেবী, ৫।১ হুইনহো রোড, কলিকাতা।

ইহার প্রথমাংশে মুদ্রিত গাছের কথা ও মন্ত্রের সাধন প্রবন্ধ জগদীশচন্দ্রের রচনা, অব্যক্ত গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত। অপর রচনাগুলির অধিকাংশই অবলা বসু মহোদয়ার রচনা, তাঁহার স্বাক্ষরে মুকুলে প্রকাশিত হয়[1] ; সম্ভবতঃ অন্য কয়টিও তাঁহারই লিখিত।

পত্রাবলী। জগদীশচন্দ্র বসু। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী-সমিতি। ৯৩।১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা। শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশ ৩০ নভেম্বর ১৯৫৮।

এই পত্রসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ৮৮ খানি ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ২ খানি চিঠি সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ৮ খানি ও শ্রীহেমলতা ঠাকুরকে লিখিত ১ খানি অবলা বসুর চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে।

---

১. শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপার্থ বসু অনুগ্রহপূর্বক পুরাতন 'মুকুল' পত্র হইতে, এই রচনাগুলি যে অবলা বসুর, তাহা সন্ধান করিয়া দিয়াছেন।

জগদীশচন্দ্রের রচনা-সংবলিত গ্রন্থ

কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম। (১৩০০-১৩১৫) প্রকাশক—এইচ. বসু, পারফিউমার, দেলখোস হাউস, কলিকাতা। ১লা বৈশাখ, ১৩১৭।

এইচ. বসু বা হেমেন্দ্রমোহন বসু-প্রবর্তিত কুন্তলীন গল্প-পুরস্কার-প্রতিযোগিতা বাংলা সাহিত্যে এক সময় সুপরিচিত ছিল—শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্প, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও হেমেন্দ্রমোহন বসুর জন্য গল্প লিখিয়াছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলি প্রতিবৎসর কুন্তলীনের উপহাররূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত। এই গ্রন্থে প্রথম বারো বৎসরের প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্প একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথমবারের প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিল জগদীশচন্দ্রের রচনা 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। "এই উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে পুরস্কার (৫০্) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছিল।" পরে অব্যক্ত গ্রন্থে 'পলাতক তুফান' নামে ইহা জগদীশচন্দ্রের রচনারূপে স্বীকৃত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশকালে গল্পটির প্রভূত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

প্রথম বৎসরের কুন্তলীনের উপহার পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকিবে, তাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল। জীবন। শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। ১৩২৪।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের পত্র ও উক্তি ৫৪১ ও ৫৪২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

জয়ন্তী-উৎসর্গ। রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা কর্তৃক প্রকাশিত। ১১ই পৌষ ১৩৩৮।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তি-উৎসবে প্রকাশিত রচনাসংগ্রহ। ইহার প্রথম প্রবন্ধ জগদীশচন্দ্রের লিখিত 'জয়ন্তী' [*Golden Book of Tagore*-এ প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধের শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কৃত অনুবাদ]।

রজত-জয়ন্তী। ভারত সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর। (১৯১১-১৯৩৫)। সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। প্রথম সংস্করণ, জুন ১৯৩৫...।

এই প্রবন্ধসংগ্রহে জগদীশচন্দ্রের 'জড় জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ এবং প্রাণী-জগৎ' রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। [ইহা অব্যক্তে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত]।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। পাঠশালা কার্যালয়। ৩০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গ্রন্থকারের ভূমিকার তারিখ, ৩ জানুয়ারী ১৯৩৮।

৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায়, 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসুকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্র বা মন্তব্য মুদ্রিত। ইহা মূলতঃ বাংলায় লিখিত কিনা তাহা জানিতে পারি নাই।

অজিতকুমার ঘোষ

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও জীবন -কথা ॥ গ্রন্থসূচী

বাংলা

জগদানন্দ রায়। **বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার।** অতুল লাইব্রেরি; কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ও ইসলামপুর, ঢাকা। 'বিজ্ঞাপনে' তারিখ, আশ্বিন ১৩১৯। পৃ. ২, |০, ২৪১।

সূচী ॥ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু; বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বা অদৃশ্যালোকের প্রকৃতি; বৈদ্যুতিক তরঙ্গই কি অদৃশ্যালোক উৎপাদক; আকাশ তরঙ্গ; বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সমতলীভবন। দ্বিতীয় খণ্ড: প্রাণী ও উদ্ভিদ— জড় ও জীব; উদ্ভিদের আঘাত অনুভূতি, প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা; পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন; রসশোষণ, উদ্ভিদের বৃদ্ধি; উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য; উদ্ভিদ্ ও আলোক; উদ্ভিদের নিদ্রা, আচায বসুর শেষ পুস্তক। তৃতীয় খণ্ড: জড় ও জীব— সজীব ও নির্জীব; জড় জীবের আঘাত-অনুভূতি; অবসাদ; দৃষ্টিতত্ত্ব, দৃষ্টিবিভ্রম; ফোটোগ্রাফি।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী নানা দেশে নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের ভাষায় তাহা প্রচারিত না হওয়া, বড়ই ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিয়াছে।' 'এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আচার্যবরের···কয়েকটি স্থূল তত্ত্বের' কথা লিখিত আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। **উদ্ভিদের চেতনা।** আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৩৬। পৃ. ||০, ৮৬।

সূচী ॥ প্রাণী ও উদ্ভিদ; গাছের চেতনা; রস-আকর্ষণ ও রস-সঞ্চালন; উদ্ভিদের আলোকতৃষ্ণা; উদ্ভিদের স্নায়ু; উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন।

ফণীন্দ্রনাথ বসু। **আচার্য জগদীশচন্দ্র।** বরদা এজেন্সি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ভাদ্র ১৩৩৮। পৃ. ২০৫।

সূচী ॥ জন্মকথা ও পিতৃপরিচয়, বিদ্যারম্ভ; ভারতে শিক্ষা; প্রথমবার বিলাত যাত্রা; সরকারি চাকরি গ্রহণ; দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা; পারিস কংগ্রেস ও বিলাত প্রবাস; বসু বিজ্ঞান মন্দির; বঙ্গসাহিত্য ও জগদীশচন্দ্র; ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন; জগদীশচন্দ্রের মধুপর্ক; ঐতিহাসিক কাহিনী; বৈজ্ঞানিক গবেষণা; সপ্ততিতম জন্মোৎসব; জাতীয় সম্বর্ধনায় জগদীশচন্দ্র; প্রতিষ্ঠা; জগদীশচন্দ্রের দান।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।** পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। 'ভূমিকায়' তারিখ, ৩ জানুয়ারি ১৯৩৮। পৃ. ||০, ৯৬।

'আচার্যদেবের বিভিন্ন লেখা এবং তাঁহার নিকট হইতে যে সব কথা শুনিয়াছি, উহা এই পুস্তকের মালমসলা যোগাইয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহার কথা দিয়াই তাঁহার পরিচয় দিয়াছ।'— ভূমিকা।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -সংকলিত। **জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার**। বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১ ভাদ্র ১৩৫০। পৃ. ৪০।

পরবর্তী মুদ্রণে (কার্তিক ১৩৫১) শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর তালিকা সংযোজিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। **চিঠিপত্র** ষষ্ঠ খণ্ড। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মে ১৯৫৭। পৃ. ৷৵০, ২৬২।

প্রধানত জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর এই সংগ্রহের পরিশিষ্টে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কবিতা, নিবন্ধ, পত্র, 'রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রশ্নোত্তর', 'জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য পত্র', এবং বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়ে জগদীশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বহু তথ্য গ্রথিত হইয়াছে।

মনোরঞ্জন গুপ্ত। **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু**। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫ আগস্ট ১৯৫৮। পৃ. ২, ৯৪।

গ্রন্থারম্ভে সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী এবং গ্রন্থশেষে ছয়টি পরিশিষ্টে জগদীশচন্দ্রের রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সূচী এবং জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রের তালিকা মুদ্রিত।

মণি বাগচি। **বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র**। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ২০৪ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। নবেম্বর ১৯৫৮। পৃ. ১২, ১৭৮।

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র। মূল জীবনী, শুভেন্দু ঘোষ ; সম্পাদনা দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫। পৃ. ১৵, ২৫০।

প্রথম খণ্ডে জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা আলোচিত।

দ্বিতীয় খণ্ড বিভিন্ন রচনার সংকলন। যথা— 'আচার্য জগদীশচন্দ্র ও চারণকাব দ্বিজেন্দ্রলাল রায়', দেবকুমার রায়চৌধুরী ; 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ; 'জগদীশচন্দ্র বসু', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ; 'মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের শ্রদ্ধাঞ্জলি' ; 'জগদীশচন্দ্র···প্রসঙ্গে দুই রুশ বিজ্ঞানী', এম্. রাদোভ্স্কি ; জীবনের ঘটনার কালানুক্রমিক তালিকা ; এতদ্ব্যতীত, রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ড হইতে জগদীশচন্দ্রের তিনটি প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা সংগৃহীত হইয়াছে।

<u>শিশু ও কিশোর -পাঠ্য</u>

অনিলচন্দ্র ঘোষ। **আচার্য জগদীশ** জীবনী ও আবিষ্কার॥ প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 'ভূমিকা'য় তারিখ, আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ॥০, ১৩২।

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক হইতে বিবরণ গৃহীত।

সুধীন্দ্র রাহা। **আচার্য জগদীশচন্দ্র**। শরৎ-সাহিত্য-ভবন, ২৫ ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ১৩৫৬। পৃ. ৭২।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। **জগদীশচন্দ্র**। স্বাক্ষর, ১১বি চৌরঙ্গি টেরাস, কলিকাতা। ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬। পৃ. ।০, ৬৬। মূল্য এক টাকা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র। **আচার্য জগদীশচন্দ্র**। শিশু সাহিত্য সংঘ, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। অগ্রহায়ণ ১৩৬৩। পৃ. ৵০, ৩০।

অনাদিনাথ পাল। **আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা**। আসাম বুক ডিপো, ১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। ১৩৬৫। পৃ. ॥০, ৩৪।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -সংকলিত। **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু**। জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশত-বার্ষিকী সমিতি, কলিকাতা। ১৯৫৮। পৃ. ২, ৪৬।

গ্রন্থকারের 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' (১৯৩৮) ও 'জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার' (১৩৫০) হইতে সংকলিত।

ইংরেজি

SIR. J. C. BOSE. Biographies of Eminent Indians Series. G. A. Natesan & Co, Madras. Pp. 47. June 1918.

পুস্তিকাটিতে পরিশেষে প্যাট্রিক গেডিস -লিখিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বিবরণ ("The Indian Temple of Science") উদ্ধৃত আছে। লেখকের নাম নাই; *Century Review* পত্রে ফণীন্দ্রনাথ বসু -লিখিত জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে প্রবন্ধ হইতে পুস্তিকাটির অনেক উপকরণ সংগৃহীত, এইরূপ উল্লেখ আছে।

Patrick Geddes. THE LIFE AND WORK OF JAGADIS C. BOSE. Longmans Green and Co., 39 Paternoster Row, London. 1920. Pp. XII. 260.

CHAPTERS : Childhood and Early Education ; College Days at Calcutta and in England ; Early Struggles ; First Researches in Physics—Electric Waves ; Further Physical Research and its Appreciation ; Physical Researches Continued—The Theory of Molecular Strain and its Interpretations ; Response in the Living and the Non-Living ;

Holidays and Pilgrimages ; Plant Response ; Irritability of Plants ; The Automatic Record of Growth ; Various Movements in Plants ; The *Response of Plants to Wireless Stimulation* ; Tropisms : The Sleep of Plants ; Psycho-Physics : Friendships and Personality ; The Dedication ; The Bose Research Institute.

বাল্যজীবন, বিশ্ববিজ্ঞান-সভায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া জগদীশচন্দ্রকে যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় তাহার ইতিহাস, সুদীর্ঘ বিজ্ঞানসাধনার বৈজ্ঞানিক তথ্যবহুল বর্ণনা, এবং পরিশেষে মানুষ জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বিবরণ দিয়া লেখক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই পুস্তক জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনার আকর-গ্রন্থ রূপে বিবেচিত।

SIR JAGADISH CHANDER BOSE. HIS LIFE, DISCOVERIES AND WRITINGS. G.A. Natesan & Co., Madras. Pp. viii, 248. September, 1921.

এই গ্রন্থের প্রথমাংশ (পৃ ১-৪০) জগদীশচন্দ্রের জীবনী, পরবর্তী অংশে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ ও অভিভাষণাবলী বিষয়ানুক্রমে মুদ্রিত (পৃ. ৪১-২১৭)। অতঃপর মডার্ন রিভিউ পত্র (১৯১২) হইতে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-প্রবন্ধাবলী ইত্যাদির তালিকা সংকলিত (পৃ. ২১৮-২৪০)। পরিশেষে প্যাট্রিক গেডিস -লিখিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

D. M. Bose. J. C. BOSE'S PLANT PHYSIOLOGICAL INVESTIGATIONS IN RELATIONS TO MODERN BIOLOGICAL KNOWLEDGE The Bose Research Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. The Preface is dated September, 1949. Pp. 80.

TRANSACTIONS OF THE BOSE RESEARCH INSTITUTE, Vol. vii, 1947-48 হইতে পুনর্মুদ্রিত।

D. M. Bose. **JAGADISH CHANDRA BOSE : A LIFE SKETCH**, Bose Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. 1958. Pp. 31.

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা ও বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত।

D. M. Bose. SCIENTIFIC ACTIVITIES OF JAGADISH CHANDRA BOSE. Bose Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. 1958. Pp. 18.

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘকালব্যাপী (১৮৯৪-১৯৩৩) বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস বর্ণিত।

Amal Home [Ed.]. ACHARYA JAGADIS CHANDRA BOSE. BIRTH CENTENARY 1858-1958. Acharya Jagadis Chandra Bose Birth Centenary Committee, 93/1 Upper. Circular Road, Calcutta. November 30, 1958. Pp. viii, 84. Price Rupees Two Only.

CONTENTS : Jagadis Chandra Bose—The Story of His Life ; To Jagadis Chandra Bose, Rabindranath Tagore ; The Voice of Life, Jagadis Chandra Bose ; Memorial Address, Rabindranath Tagore ; From Romain Rolland to Jagadis Chandra, A Letter ; The Bose Institute To-day ; Jagadis Chandra Bose—A Chronology.

গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের 'To Jagadis Chandra Bose' কবিতার (১৯০১) মূল বাংলা পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত আছে। ইহা ছাড়া জগদীশচন্দ্র বসুর কয়েকটি এবং আরও অনেকগুলি চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

EXHIBITION CATALOGUE : Acharya Jagadish Chandra Bose Birth Centenary. 1958.

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে কয়েকদিনব্যাপী যে প্রদর্শনী হয় তাহার বস্তুসম্ভারের বিস্তৃত তালিকা ছাড়া ইহাতে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, কেল্‌ভিন, বার্নার্ড শ, লর্ড র‍্যালে প্রমুখ মনীষীদের পত্রের পাণ্ডুলিপিচিত্র ; জগদীশচন্দ্র, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির, জগদীশচন্দ্রের উদ্‌ভাবিত কয়েকটি যন্ত্রের এবং জগদীশচন্দ্র-বসু-সংগ্রহের কয়েকটি চিত্র মুদ্রিত আছে।

JAGADISH CHANDRA BIRTH CENTENARY CELEBRATION ADDRESSES AND TWENTINTH MEMORIAL LECTURE. 30th November 1958. Bose Institute, 93/1 Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta. Pp. 22.

Welcome Address, Dr. B. C. Roy ; Address, Dr. D. M. Bose ; Inaugural Address, Sri Jawaharlal Nehru ; Presidential Address, Sm. Padmaja Naidu ; Vote of Thanks, Prof. S. K. Mitra ; Acharya Jagadish Chandra Bose Memorial Lecture, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan.

Arthur James Todd. THREE WISE MEN OF THE EAST AND OTHER LECTURES. University of Minnesota Press, U.S.A. 1927. Pp. X, 240.

এই গ্রন্থটি দেখিবার সুযোগ হয় নাই। A. Arouson প্রণীত RABINDRANATH THROUGH WESTERN EYES (1943) গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইহার উল্লেখ আছে।

<u>জগদীশ-প্রসঙ্গ-সম্বলিত ইংরেজি গ্রন্থ</u>

T. C. Bridges and H. Hessell Tiltman. MASTER MINDS OF MODERN SCIENCE. George G.-Harraps & Co, London. New Edetion 1935. Pp. 278,

ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় (পৃ. ২৮-৩৬) "Do Plants and Metals Feel ? The Amazing Experiments of Sri Jagadish Bose."

L. F. Rushbrook Williams (*Ed.*) **GREAT MEN OF INDIA**. The Home Library club. ***n. d.***

ইহাতে (পৃ. ৫৮৩-৮৯) ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ লিখিত "Sir Jagadish Chandra Bose and his Researches into Plant Physiology" নামে একটি প্রবন্ধ আছে।

এইরূপ আরো গ্রন্থ থাকাই সম্ভব। যে কয়টি হার আমাদের লক্ষ্যগোচর হইয়াছে তাকে উল্লেখ করা হইল।[২]

জর্মন

Patrick Geddes. **LEBEN UND WERK VON SIR JAGADIS C. BOSE.** Rotapfel-Verlag. Erlenbach-Zurich und Leipzig. ? Pp. 263.

প্যাট্রিক গেডিস-রচিত পূর্বোল্লিখিত ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ।

শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

---

২. শ্রীশোভন বসু ১৯৫৮ নভেম্বর সংখ্যা মডার্ন রিভিউতে, ঐ পত্রে (১৯০৭-৩৮) মুদ্রিত জগদীশচন্দ্র বসু-সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনার একটি সূচী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জগদীশচন্দ্রের জীবন ও আবিষ্কার-বিষয়ক বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও জগদীশচন্দ্র

পরিষৎ-সভাপতি মহাশয় বর্তমান সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যোগের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। নিম্নমুদ্রিত সংকলনে সেই প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইল।

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য

জগদীশচন্দ্র ১৩১৮ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিপদে বৃত হন, ১৩২৩ সালে তিনি পরিষদের সভাপতিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু তাহার পূর্বেই পরিষদের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন, ১৩১০ সালে পরিষৎ-কর্তৃক বিশিষ্ট সদস্য পদে নির্বাচনের সূত্রে। প্রথমাবধি পরিষদে 'সাহিত্যকে কোনও ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই' এখানে 'আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি,' এজন্য সাহিত্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানসাধকের স্থানও পরিষদে সসম্মানে স্বীকৃত হইয়াছে; বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে, সভাপতিপদে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তন করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, পরে তিনি পরিষদের সভাপতির আসনও অলংকৃত করেন।

প্রায় দুই বৎসরকাল বিলাতে অবস্থানপূর্বক বিদেশে বিজ্ঞানীসমাজে নিজের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৩০৯ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে প্রত্যাগত হইলে দেশের শিক্ষিতসমাজে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্রকে বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্বাচিত করিয়া পরিষৎ এই আনন্দের অংশী হইয়াছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও এই বৎসর (১৩১০) পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ইহার পূর্বেই সহজ ভাষায় কয়েকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সহিত একাত্মতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এখন স্মৃতিমাত্র, অনুরূপ অন্যান্য সম্মিলন এখন তাহার স্থান লইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে এই বার্ষিক মিলনসভা যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তদবধি যতকাল ইহা জীবিত ছিল এই সম্মিলন দেশের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছে। ১৩১৮ সালে ময়মনসিংহে চতুর্থ অধিবেশনে এই সম্মিলনের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন জগদীশচন্দ্র। সাহিত্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানসেবকের স্থান আছে কিনা, অভিভাষণের সূচনায় এই আলোচনাপ্রসঙ্গে সাহিত্যের একটি উদারমূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিবার কথা যে তিনি বলিয়াছিলেন, পরিষদের পক্ষে এখনও তাহা স্মরণ করিবার আবশ্যকতা আছে—

"এই সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্ব্বত্র

গভীরভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দর অলঙ্কার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

"পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদপ্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়. কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

"অপর দিকে, বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এক-কে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।

"আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতঃই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সঙ্কীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

"ফলতঃ জ্ঞান-অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে-কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাঁহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।"

কবি ও বিজ্ঞানীর যোগের বিষয় তিনি এই অভিভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য—

"কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার

ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।...

"বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না। এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

"বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

"কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন।"

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মনে পড়ে, এই যুগেই বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ কবি ও বিজ্ঞানীর যে যোগ হইয়াছিল তাহার কথা— সমগ্র দেশ তাহার ফলভাক্ হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র স্বয়ংও কবি-মনীষী, 'আদি কবির প্রতিচ্ছবি'[১] বলিয়া অভ্যর্থিত হইয়াছেন দেশে-বিদেশে; তিনি বিজ্ঞানকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহারও মূলকথা বর্ণিত হইয়াছে এই অভিভাষণে—

"এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদ্‌কে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে

১. দ্রষ্টব্য, পরবর্তী প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষদে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত -কৃত 'আচার্য্য-প্রশস্তি'।

এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।"

বিজ্ঞান-সাহিত্যের আলোচনা ও সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন সাহিত্য-পরিষদের 'উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়' বলিয়া প্রথমাবধিই স্বীকৃত, ময়মনসিংহ অধিবেশনের পর হইতে সাহিত্য-সম্মিলনের একটি 'বৈজ্ঞানিক বৈঠক' বা বিজ্ঞান-শাখাও গঠিত হয়।

পরিষদের সভাপতি

১৩২৩ সালের ১৪ শ্রাবণ দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে, 'নবীন ও প্রবীণ' উভয় দলের শ্রদ্ধাভাজন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সভাপতিপদে বৃত হন। প্রথম মাসিক অধিবেশনে (৪ ভাদ্র ১৩২৩) উপস্থিত হইয়া তিনি পরিষদের উন্নতিকল্পে যে-সকল প্রস্তাব করেন, কার্যবিবরণীতে তাহার আভাস আছে—

"প্রথমে তিনটি বিষয়ে এই সভার উন্নতি করিতে আমি ইচ্ছা করি। একটা বিষয় আজ বলিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, অল্পদিনে সাহিত্য-পরিষৎ উচ্চস্থান অধিকার করিবে। ফরাসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, পরিষদকে তাহার তুল্য করিতে হইবে।. সেখানকার নানা ছবি ও নানা দুর্লভ পুস্তক এমন সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান আছে যে, সেখানে প্রবেশ করিলে লোকমাত্রেরই কেমন একটা তন্ময়ভাব আসে—Academy-র সৌন্দর্যে ও মহত্বে যেন মন মুগ্ধ হয়। পরিষৎ-গৃহে আসিলে যেন সেইরূপ ভাব আসে, সেইরূপ ভাবে পরিষৎকে গড়ে তুলতে হবে। অনেক অমূল্য জিনিষ এখানে আছে, বহু বড়লোকের হাতের লেখা, রামমোহন রায়ের পাগড়ি, বঙ্কিমের কলম ইত্যাদি অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহার সুবিন্যাস নাই। এখন পরিষৎকে এমন করিতে হইবে যে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে যে, ইহা একটি মস্ত কীর্তি।...পরিষদের সমস্ত সদস্যদের চিঠি লিখে জানাতে হবে যে, প্রত্যেকে এক এক বন্ধুকে দিয়ে পরিষদের এক এক সেট বই কিনিয়ে দেন।...এই সমস্ত বিষয় কার্যে আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। জানুয়ারী মাসের মধ্যে এ কাজটা সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি নিজে ১০০৲ দিতে প্রস্তুত আছি।"

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (৪ পৌষ ১৩২৩) সভাপতিরূপে জগদীশচন্দ্র বলেন—

"এই সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির যাহাতে কেবল নামে মাত্র পর্য্যবসিত না হয়, দেশবাসীর

নিকট যাহাতে নামে ও কর্ম্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেইরূপ ইচ্ছা করি। আমি ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রথায় সাজাইব ইচ্ছা করিয়াছ।...এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমিকে বড় করিতে হইবে।..."

কেবল যে পরিষদের শিল্পসৌন্দর্যবিধানের দিকে জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তাঁহার কার্যকালে (১৩২৩-২৫) তিনি ইহার বৈষয়িক উন্নতিসাধন, কর্মীদের মধ্যে মতদ্বৈধের দূরীকরণ, সর্বোপরি, পরিষদের মূল উদ্দেশ্য 'সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন,' এ-সকল বিষয়েই উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন এবং সে উদ্‌যোগ বহুলপরিমাণে ফলপ্রসূও হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ (৫ চৈত্র ১৩২৪)[২] এবং পরিষদের কার্যবিবরণ হইতে তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ সংকলিত হইল—

"...স্থির করিলাম, সাহিত্য-পরিষদের জন্য যথাসাধ্য কার্য্য করিব এবং ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইব। যে মুমূর্ষু, সে-ই মৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে, যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্ত্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার পথে যে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে ; তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্রীভূত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

"সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই পরিষদের কতকগুলি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি দেখি, স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে যে ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিশোধের বিশেষ উপায় দেখা যাইতেছে না। অনেক অমূল্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে এমন পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে, যাহা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে। মনে হইল, কেবল সাহিত্যচর্চ্চা করিতে যাইয়া বর্ত্তমান জীবন্ত সাহিত্যের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। সভ্যদিগের নিকট অনেক টাকা অনাদায় হইয়া রহিয়াছে। পরিষদের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশি ; দেখি, পুস্তকাগারের কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই ; পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রাশি রাশি অবিক্রীত পুস্তক পরিষদভবনে এরূপ স্তূপীকৃত হইতেছে যে, তথায় মনুষ্যের চলাচল দুর্গম হইবে। অমূল্য শিলালিপি, তৈলচিত্র, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে, যাহাতে প্রবেশমাত্র দর্শকের মনে এই মন্দিরের বিশালত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদন করে।...

২. ইহা সংক্ষিপ্ত আকারে "নবীন ও প্রবীণ" নামে 'অব্যক্ত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহাতে বৈষয়িক ও একান্ত সাময়িক প্রসঙ্গ বর্জিত। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনবোধে মূল প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ উদ্‌ধৃত হইল।

"স্থায়ী ভাণ্ডার

" শুনিয়া সুখী হইবেন যে, এত অনটন সত্ত্বেও গত দুই বৎসর পুস্তকাদি প্রকাশ বা গৃহসংস্কারাদি কোন কারণেই স্থায়ী ভাণ্ডারের ঋণ বৃদ্ধি হয় নাই। বরং এই দুই বৎসরে আমরা দেড় হাজার টাকা ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হইয়াছি।··

"গৃহ-সংস্কার

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অবিক্রীত পুস্তক-স্তূপ জঞ্জালপ্রায় হইয়া পরিষৎ-ভবনে চলাফেরার পথ বন্ধ করিয়াছিল। আরও বহু বিশৃঙ্খলা ছিল, সে সব দূর না করিলে পরিষদের বিকাশ অসম্ভব হইত। নূতন আলমারী, বক্তৃতাগৃহে বসিবার আসন, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আরম্ভ করিতেই অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। এতদর্থে আমাদের অবিক্রীত পুস্তকরাশি গ্রন্থাবলীর সেট করিয়া স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্থানাভাব দূর হইয়াছে এবং আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের অধিক প্রচার হইয়াছে। ১৩০৭ হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে গড়ে ১০০৲ টাকার পুস্তক বিক্রী হইত। তাহার পর ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত গড়ে ৮০০৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসরে পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা ৩৫০০৲ টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের চতুর্গুণ মূল্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ভবিষ্যতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ১৭০০৲ টাকা রাখিয়া মন্দিরের সৌষ্ঠবের জন্য ১৮০০৲ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।··

"এখন মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িতেছে, তাহা আপনারা দেখিতেছেন। তৈলচিত্র, প্রাচীন শিলা ও মুদ্রা যথাযথ প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকাগার সুসজ্জিত হইয়াছে। পুস্তকতালিকা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে। পড়িবার স্থান প্রশস্ত হইয়াছে এবং মৌলিক গবেষণার জন্য দুইটি ক্ষুদ্র কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"পরিষদ্-গৃহে বক্তৃতা

"যে সব বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলাম, তাহা কার্য্য করিবার উপলক্ষ্য মাত্র। সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদর্থে প্রতিভাশালী মনীষিদিগের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

৩"বসু-মহাশয় স্বয়ং এবং তাঁহার আহ্বানে শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, চুনীলাল বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকে পরিষদ্-মন্দিরে লোকরঞ্জক

---

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পরিষৎ-পরিচয়," প্রথম সংস্করণ। এই সংকলনে ব্যবহৃত অন্যান্য কতকগুলি তারিখও 'পরিষৎ-পরিচয়' হইতে গৃহীত।

বক্তৃতা দান করেন।" জগদীশচন্দ্র ১৩২৪ সালের ৭ চৈত্র "আহত উদ্ভিদ্" সম্বন্ধে ও ১৩২৭ সালের ১৯ চৈত্র "স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ"[৪] সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভাপতির অভিভাষণে জগদীশচন্দ্র পরিষদে নবীন-প্রবীণে দলাদলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন দেশের সকল প্রতিষ্ঠানপ্রসঙ্গেই তাহার স্থায়ী মূল্য আছে, তাহা বিস্তারিত উদ্ধৃত হইল –

"দলাদলি

"জীবনের বহু বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানা দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্ত্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে হয় শুধু করতালি দেন, না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম্ম শুধু কর্ত্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন এক দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দামভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বহ্নি উদ্ভূত হয় তাহা অনুষ্ঠানটিকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরূক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই কারণে সাহিত্য-পরিষদে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয় সেজন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি।[৫] প্রতিষ্ঠিত কোন সাহিত্য-সমিতিকে খর্ব্ব করিয়া নিজেরা বড় হইবার প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি। সাধারণ সদস্যদিগের উদ্যমের উপর পরিষদের ভাবী মঙ্গল যে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, এ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে লিখিয়াছিলাম—'পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ্য মাত্র।' আরও লিখিয়াছিলাম যে, 'সদস্যগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্ত্তব্যশীল সভ্য নির্ব্বাচিত করেন তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শৈথিল্যই

---

৪. বক্তৃতা দুইটি 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

৫. "আমাদের সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। এই সকল মতভেদ দূর হইয়া, যাহাতে সদস্যদের মধ্যে কোন প্রকার অপ্রীতি না থাকে তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি উভয় পক্ষের মতামত গ্রহণ করিয়া, নিজ মন্তব্য সহ কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন।"—চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

ভবিষ্যৎ দুর্গতির কারণ হইবে।' এই সহজ পথ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অবলম্বিত উপায় কি শ্রেয় হইবে? তথায় প্রতিযোগিতারই পূর্ণ প্রকাশ। সহযোগিতা কি আমাদের সাধনা নয়? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পক্ষ ও বিপক্ষের ভেদ প্রবল হইয়া উঠে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করে ও কুৎসা রটায়, অন্য পক্ষও জবাবে এক কাঠি উপরে উঠেন। ইহার শেষ কোথায়? যে চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বিকশিত হয় তাহা কি এইরূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে?

"নবীন ও প্রবীণ

"নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। তবে তাহাই বিসম্বাদের প্রধান কারণ নহে। ব্যক্তিবিশেষের আত্মম্ভরিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ, ইহা প্রবীণ বা নবীন কাহারও নিজস্ব নহে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত। যদিও বার্দ্ধক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে, মন ত তাহার অনেক উপরে, সে ত চিরনবীন! মন কেন সাহস হারাইবে? অন্য দিকে নবীন, অভিজ্ঞতা অভাবে হয়ত অতি দ্রুত চলিতে চাহেন এবং বাধার কথা ভাবিয়া দেখেন না। যাহারা বহুকাল ধরিয়া কোন অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান। হয়ত কখনও প্রবীণের বহু কষ্টে অর্জ্জিত ধন নবীন বিনা দ্বিধায় নিজস্ব করিতে চাহেন। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়। প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এতদিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। যে দেশে আমাদের সামাজিক জীবনে নবীন ও প্রবীণের কার্য্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, সে স্থানেও কি একথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে?"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণের উপসংহারে জগদীশচন্দ্র পরিষদের বিষয়ে যে আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার যে রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই সংকলন সমাপ্ত করি— এই আশা যতদূর পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই রূপ যতদূর প্রকাশমান হইবে তাহার উপরেই পরিষদের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে—

"[দাক্ষিণাত্যে] গুহামন্দিরে [বিশ্বকর্ম্মার] যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্ম্মা বাঙ্গালী চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

"...আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে

পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

"সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। আন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষদ সাধকদের সম্মুখে দেব-মন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

আচার্য্য-প্রশস্তি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যখন স্বদেশে ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তখন যে সকল ছাত্র তাঁহার পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের ক খ শিখিয়াছিল, আমি তাহাদের অন্যতম। অতএব তাঁহার সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে[১] কিছু বলিতে সংকোচ বোধ করিতেছি। বিজ্ঞানক্ষেত্রে আচায্য মহাশয় যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যে জন্য ভারতবাসীর নাম জগতে এখন ঘোষিত হইতেছে. তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিতেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা করিয়া facts সংগ্রহ করেন, সজ্জিত করেন, ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই সকল facts ও ব্যাপার হইতে অদ্ভুত মনীষাবলে সত্যের আবিষ্কার করেন, নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্‌কে যদি বৈজ্ঞানিক বলা হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে প্রাজ্ঞানিক বলা উচিত। বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহারা তত্ত্বের আবিক্রিয়া করেন। এই প্রজ্ঞানকে পাশ্চাত্যগণ scientific imagination আখ্যা দিয়াছেন।

জড়ের যে জীবন আছে. উদ্ভিদের যে প্রাণন আছে, উভয়ের যে ক্লান্তি স্ফূর্ত্তি আছে, উভয়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তি ক্রীড়া করিতেছে, আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে একথা অনেকস্থলে উল্লিখিত দেখা যায়। অতএব এ সকল কথা আমরা অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কানে শুনা আর চক্ষে দেখায় অনেক অন্তর। আমরা যে সকল কথা কানে মাত্র শুনিয়াছিলাম, আচায্য মহাশয় তাহা আমাদিগকে চক্ষে দেখাইয়াছেন। এখন আমরা এই সকল প্রাচীন উপদেশের সারবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক জন পাশ্চাত্য লেখক তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক যাদুকর আখ্যা দিয়াছেন। এ-নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

এ দেশে যাঁহারা সত্য দর্শন করিতেন, তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহাদিগের প্রাচীন নাম ছিল কবি। যিনি বৈদিক সত্যের আদি স্রষ্টা, প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহাকে আদি কবি বলে—

তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সেই আদি কবির প্রতিচ্ছবি। তিনিও তত্ত্বদ্রষ্টা, সত্যের আবিষ্কর্ত্তা। অতএব তাঁহার সমক্ষে আমাদের শির আপনি প্রণত হইতেছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।[২]

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

১. ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানীসমাজে স্বীয় আবিষ্কার প্রচারান্তে জগদীশচন্দ্রের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা (১৫ শ্রাবণ ১৩২২)। "উত্তরে তিনি [জগদীশচন্দ্র] বলেন যে, বিদেশে বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ার জন্য তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন তাহা তাঁহার দেশেরই প্রাপ্য।"

২. ১৩২২ ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসী হইতে উদ্‌ধৃত।

স্বরলিপি

শ্রীধর কথক ১২২৩ সালে হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গানেও সংস্কৃতিসম্পন্ন সুমার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানতঃ কথকতায় খ্যাতিলাভ করিলেও তিনি সংগীতে বিশেষ করিয়া টপ্পায় পারদর্শী ছিলেন। বিবিধ সংগ্রহপুস্তকে তাঁহার অনেক রচনা রক্ষিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার রচিত গানগুলি একটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন— সেই খাতা হইতে সংগৃহীত বহু গান "বাঙ্গালীর গান" নামক সংকলনগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নিম্নে যে গানটির স্বরলিপি প্রদত্ত হইল তাহার সুর কয়েকটি সংকলন গ্রন্থে ঝিঁঝিট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "বাঙ্গালীর গান"-এ সুর দেওয়া আছে "সিন্ধু-পিলু"। প্রবীণ গায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক মূল সুরটি "দেশ-খাম্বাজ" জাতীয় বলিয়া মনে করেন। তাল-"আড়াঠেকা" সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। —শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

দেশ-খাম্বাজ। আড়াঠেকা

কেন যারে তারে মন দিতে বলে গো
নয়ন আমার
নিবারণ করি যদি অমনি ভাসে নয়ন জলে গো।
মন নয় মনেরি মত
নয়নেরি অনুগত
বুঝায়ে রাখিব কত নানা পথে চলে গো॥

স্বর সংগ্রাহক : শ্রীকালীপদ পাঠক　　স্বরলিপি : শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

গা গা গা মা II { গমা -পধা -ণা পা । মজ্ঞা রা মা পা ।
কে ন যা রে　তা• •• • রে　ম• ন দি তে

না না র্সা -া । -া -া -া -া ॥ I
ব লে গো •　• • • •

(ধা ণা -ধণা ‿ -পা । -া -া -া পা ।
ন য় •• ন্　• • • আ

পধণা -পধা -র্সা -া । ণা ধণা গা মা)} I
মা•• •• • র্　কে ন• যা রে

না না নর্রা -র্সনধা । না র্সা না র্সা ।
নি বা র• ••ণ্　ক রি য দি

গা মা পা না । না র্সা -না -র্সা I
অম্ নি ভা সে ন য় ॰ ন্

ধা র্সা -ণা ধপা । পা পা -পা পা ।
জ লে গো ॰ ॰ ন য় ন্ আ

পধণা -পধা -র্সা -া । ণা ধপা গা মা II
মা॰॰ ॰ ॰ ॰ র্ "কে ন ॰ যা রে"

II না -া নর্রা -র্সনধা । -া না না র্সা ।
ম ন্ ন ॰ ॰ ॰ য়্ ॰ ম নে রি

না র্সা -া -া । পা না না না I
ম ত ॰ ॰ ন য় নে রি

র্সা র্সর্রর্সা -না -র্সা । ধর্সা ণা -া -া ।
অ স্থ ॰॰ ॰ ॰ গ॰ ত ॰ ॰

-ধণা -ধপা -মধা -মণা । -ধা -পা -া -া I
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

মা পা মপধা ধপা । মা মগা -রমা -মগা ।
বু ঝা য়ে॰॰ রা খি ব ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

-রা ন্া সা -া । পা না না র্সা I
॰ ক ত ॰ ॰ না না প থে

ধা র্সা ণা -ধপা । পা পা -পা পা ।
চ লে গো ॰ ॰ ন য় ন্ আ

পধণা -পধা -র্সা -া । ণা ধপা গা মা II II
মা॰॰ ॰॰ ॰ র্ "কে ন॰ যা রে"

শ্রী গিরীন্দ্রমোহিনী

জন্ম ১৮ অগষ্ট ১৮৫৮ মৃত্যু ১৬ অগষ্ট ১৯২৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
১৩৬৫

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি—আদিকাণ্ড

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির মধ্য হইতে কৃত্তিবাসের মূল রচনা উদ্ধার করিবার চেষ্টা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ১৩০৭ ও ১৩১০ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রাচীন পুথি অবলম্বনে স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় অযোধ্যা ও উত্তর কাণ্ডের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরিষদ্ বা দত্ত মহাশয় তাঁহাদের প্রারব্ধ কার্যে আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। মনে হয়, সন্তোষজনক উপকরণের অভাবই তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিল।

কৃত্তিবাসের সমসাময়িক বা অল্প পরবর্তী কালে লিখিত পুথি পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের হস্তলিখিত কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত যে অজস্র পুথি পাওয়া যায়, সেগুলি নানা সময়ের নানা রচনায় ভারাক্রান্ত ও বিকৃতিপূর্ণ— তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিল অপেক্ষা অমিলের পরিমাণ বেশি। এই অবস্থায় দত্ত মহাশয়ের পরে অনেক দিন যাবৎ আর কেহ কৃত্তিবাসের আসল রচনা উদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার পূর্বে ও পরে রামায়ণের অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য। তবে তাহাদের অধিকাংশই যথেচ্ছ পরিবর্তনাদি সহ একে অপরের পুনর্মুদ্রণ মাত্র— কোথাও কোন নূতন উপকরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে তাহার সম্যক্ পরিচয় জানিবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে সংস্করণগুলি সহজলভ্য না হওয়ায় তাহাদের তুলনামূলক আলোচনা বা পুথির সহিত পাঠ মিলাইয়া দেখা দুঃসাধ্য। এত অসুবিধা সত্ত্বেও নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় আর একবার কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৩৪৩ সালে তাঁহার সম্পাদিত রামায়ণের আদিকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণের ভূমিকা হইতে জানা যায়— ভট্টশালী মহাশয় সুন্দরকাণ্ডের সম্পাদন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরকাণ্ডের সম্পাদনকার্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। এইগুলি এখন কি ভাবে আছে জানি না— ইহাদের কার্য কতটা উদ্দেশ্যের অনুকূল হইয়াছিল, তাহাও বলিবার উপায় নাই। তবে আদিকাণ্ডের কার্য পণ্ডিতসমাজকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। ভট্টশালী মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রন্থসম্পাদনে তিনি যে মূল নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ঠিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মতে—'যে কৃত্তিবাসী পুথির বিষয়বিন্যাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা মূল রামায়ণের অনুগত, তাহাই কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণের খাঁটি পাঠ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।' (পৃ. ৩৸৵০)। কারণ, 'কৃত্তিবাস মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন— রাজা যখন তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা

করিতে আদেশ দিলেন, তখন মূলতঃ তিনি বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।' (পৃ. ॥৶০)। অন্য সুদৃঢ় প্রমাণের অভাবে এ যুক্তি মানিয়া লওয়া কঠিন। পাঠসংগঠনের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবলম্বিত নীতি সকল ক্ষেত্রে সন্তোষজনক মনে হয় না। বন্দনা-পয়ারসমূহের স্থলে তিনি একখানি পুথির পাঠকে মানিয়া নিয়াছেন। কারণ, আলোচিত অন্যান্য পুথির মধ্যে কোন কোনটির বন্দনা 'নিতান্তই গায়েনের বন্দনা'— কোনটির বন্দনা 'নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও কুরচিত।' গৃহীত পাঠ সম্পাদকের মতে 'গ্রহণযোগ্য এবং সম্ভবতঃ উহা কৃত্তিবাসরচিত।' (ভূমিকা, পৃ. ৩॥৶০)। প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনে এই জাতীয় যুক্তি সমর্থনযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। ভট্টশালী মহাশয় যে সমস্ত পুথি মিলাইয়া গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মিলের তুলনায় অমিলও বড় কম নয়। এই অমিল অংশগুলিও তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ফলে পাঠভেদের এই গভীর অরণ্যের মধ্য হইতে আসল কৃত্তিবাসকে বাহির করা দুঃসাধ্য। তথাপি ভট্টশালী মহাশয়ের এই পরিশ্রম নিষ্ফল নহে; তাঁহার পূর্বে রামায়ণের পুথির এরূপ বিশ্লেষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আর কেহ করেন নাই। এ পর্যন্ত পুথির যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। রামায়ণের পুথিগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে কৃত্তিবাসের মূল রচনা উদ্ধার করা কতটা সম্ভবপর বুঝা যাইতে পারে— হয়ত বা উদ্ধারের একটা সূত্র মিলিতে পারে। পুথি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ নামে কি বস্তু আমরা পাইতেছি। কৃত্তিবাস বা অন্য যে-কোন কবির রচনাই ইহাদের মধ্যে রক্ষিত হউক না কেন, নানা দিক্ হইতে—বিশেষ করিয়া কাহিনীর বিচিত্র রূপান্তরের দিক্ হইতে—ইহাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে। ইহা মনে করিয়া আমি কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালাস্থিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথিগুলির আলোচনা আরম্ভ করি। ফলে, কিছু কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সুধীসমাজের বিচার-বিবেচনার জন্য সেগুলি এখানে উপস্থাপিত করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে, পুথিগুলির তুলনামূলক পরিচয় ও ইহাদের বিষয়বস্তুর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

আদিকাণ্ডের অনেকগুলি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত, কতকগুলি বিস্তৃত,[১] কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ বা পালার পুথি। গ্রন্থের যে-কোনও অংশ স্বতন্ত্রভাবে পুথির আকারে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত হইবার কারণ বুঝা যায় না। ১৪২১ সংখ্যক পুথিখানি ক্ষুদ্র হইলেও আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ পুথির বিবরণে ইহা সম্পূর্ণ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ রাম-লক্ষ্মণের মিথিলায়

---

১. কৃত্তিবাসের রামায়ণের এই দুইটি রূপের সন্ধান অন্যান্য পুথিশালার পুথিগুলির মধ্যেও পাওয়া যাইতে পারে মনে হয়। পুথির সামান্য বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কোন পুথি ক্ষুদ্র, কোনখানি বৃহৎ। ইহাদের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক বিশ্লেষণ আবশ্যক।

গমন, বিবাহের প্রস্তাব ও হরধনুর্ভঙ্গ— এই অংশটুকু মাত্র ইহাতে আছে। ৪৮৩১ সংখ্যক পুথিখানির আরম্ভ মারীচের পলায়নের পর রামের বিবাহের প্রস্তাব হইতে। ৩৮৫১ পুথিতে রামসীতার বিবাহব্যবস্থা, বিবাহানুষ্ঠান ও বাসরবর্ণনা অংশমাত্র আছে। ১৭ সংখ্যক পুথির আরম্ভ ভগীরথের গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ লইয়া। অথচ এই পুথিগুলির একখানিও খণ্ডিত নয়— পত্রাঙ্ক এক হইতে আরম্ভ করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে শেষ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ৩৬৫২, ৬৬০২ সংখ্যক পুথিতে আদিকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়—যদিও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে মিল খুব বেশি নাই। প্রথম পুথিখানি ভট্টশালী মহাশয়ের সংস্করণে 'ঝ' পুথি নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহার বিষয়বস্তু ঐ সংস্করণের অনুরূপ। ইহা ১-৪০ পত্রে সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় পুথিখানিতে আদিকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ডে সীতার অগ্নিপরীক্ষা অংশ পর্যন্ত আছে। ইহাতে আদিকাণ্ড ৫৩ পত্রে সম্পূর্ণ। পুথিখানিতে একটি বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পুথির পংক্তিগুলির মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে লেখক বা মালিকের নাম লিখিত হইয়াছে। এরূপ সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্ননির্দিষ্ট নামগুলি লক্ষণীয়— গঙ্গাচন্দ্র গুহ (৩ক, ১০ক, ১৩খ, ২০খ, ৬৬খ, ৭০খ, ৭৩খ, ৮০খ, ৮২খ, ১১৬খ, ১১৮খ, ১২৬খ, ১৩০খ, ১৩১খ, ১৩২খ, ১৩৪খ, ১৩৫খ প্রভৃতি), শ্রীরামরুদ্র (১০ক), কালীকান্ত (১৬খ), রামকান্ত সেন (৩১ক), কৃষ্ণচন্দ্র সেন (৩৫খ), গুরুপ্রসাদ বসোস্য (৫৩খ), কৃষ্ণদাস দাস (৬৯খ) রামমাণিক্য দে (৭২খ), জগচ্চন্দ্র দাস (৭৭খ, ১৯৮খ), ভৈরবনাথ (৭৭ক, ৯৬খ, ৯৭খ, ১০০খ), নিলমণি শর্ম্মণঃ সাং রামপুর (৮৪খ), রামকমল দত্ত (৮৫খ), ভৈরবনাথ সেন (৮৮খ), রামকমল (৯২খ), ভৈরবনারায়ণ (১০৩খ), রামকানাই···দাষস্য (১৫৮খ)। ইঁহাদের মধ্যে গঙ্গাচন্দ্র সম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহাকে মাঝে মাঝে রাজা বলা হইয়াছে (২০খ, ৫৬খ)। তাঁহার বাড়ী ছিল গোবিন্দীয়া, মহয়তপুর (৮২খ, ১১৬খ, ১২৬খ, ২০৩খ)। ১০ক পত্রে রামরুদ্র ও গঙ্গাচন্দ্রের নাম একত্র উল্লিখিত হইয়াছে— শ্রীরামরুদ্রস্য পূর্বা কীর্তি ইদানীং শ্রীগঙ্গাচন্দ্র গুহস্য।

এই পুথির মতে বাল্মীকি নর্মদানদীর কূলে তপস্যা করিতে যান (৪খ)—লোমপাদ বঙ্গদেশের রাজা (২৩খ)। ইহাতে সূর্যবংশের বংশলতিকা বর্ণন প্রসঙ্গে রামায়ণের প্রতি কাণ্ডের সার বর্ণনা করা হইয়াছে (৬খ-১২খ)। এই প্রসঙ্গে রামায়ণকে মহাপুরাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (ইতি রামায়ণে মহাপুরাণে আদিকাণ্ডের বংশাবলী সম্পূর্ণ—১২খ)। পুত্রলাভার্থে দশরথের করণীয় যজ্ঞে কামধেনুর দুগ্ধের প্রয়োজন হয়। কামধেনুর জন্য তাই দশরথের ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় (২৭খ)। কামধেনুর দুগ্ধের ঘৃত দ্বারা হোম করিতে অগ্নি উথলিয়া উঠে (ঘৃত হুনিতে[1] যেন উথলে অগ্নি—৩০খ)। ইহাতে রামচন্দ্র-নাবিক-সংবাদ নাই, শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের মাহাত্ম্যবর্ণনা নাই। রাম প্রভৃতির জন্ম ও বাল্যলীলা প্রভৃতি ইহাতে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১. এইরূপ শব্দ অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে :

ঘৃত হুনিবেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি (২৭খ)।

৩, ৪, ১৩, ১৭, ২৫৫, ৩৮৫১, ৪৮৩১ সংখ্যক পুথির মধ্যে বিস্তৃততর কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। কাহিনী ছাড়া ইহাদের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। কোন কোন পুথিতে কৃত্তিবাসের জন্মদিন যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবেই এই সমস্ত পুথিতে বিভিন্ন রাজাদের জন্মদিনও উল্লিখিত হইয়াছে, কোথাও কোথাও কৃত্তিবাসের জন্মদিনের সহিত এই দিনগুলি একেবারে মিলিয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে—

আদিত্যবার পঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাসে।
পুত্র প্রসবিল কন্যা রাত্রি অবশেষে॥
ত্রিশঙ্খের পুত্র রুক্মাঙ্গদের জন্ম (৩।৪৮ক)

আদিত্যবার পঞ্চমী পুণ্যাহ মাঘ মাসে।
পুত্র প্রসবিল রাণী রাত্রি অবশেষে॥
রুক্মাঙ্গদের জন্ম (১৩।৪৩ক)

মাঘ মাস শুক্লপক্ষের পঞ্চমী।
রাত্রিকালে প্রসব হইল মুনির নন্দিনী॥
রত্নাকরের জন্ম (১৩।৩ক)

আদিত্যবার পঞ্চমী পুণ্যাহ মাঘ মাসে।
প্রসবিল পুত্র রাণী জন্ম বিষ্ণু অংশে॥
দশরথের জন্ম (১৩।৭৭খ)

পঞ্চমী তিথি পুণ্যাহ মাঘ মাসে।
পুত্র প্রসবিল রাণী রাত্রি অবশেষে॥
দিলীপের জন্ম (১৩।৭০ক)

শ্রীপঞ্চমী তিথি পুণ্য মাঘ মাসে।
প্রসবিলা রাজরাণী রাত্রি অবশেষে॥
দিলীপের জন্ম (১৭।১৫খ)

আদিত্যবার পুণ্যমাসি পুণ্য মাঘ মাস।
প্রসব হইলা রাণি রাত্রি অবশেষে॥
অজ্যাবৃত্তের পুত্র ভারতের জন্ম (৩।৩৩ক)

পুণ্যতিথি একাদশী বৈশাখ মাসে।
প্রসব হইল পুত্র জন্ম বিষ্ণুর অংশে॥
ভগীরথের জন্ম (৩।৬৭ক)

আদিত্যবার পৌর্ণমাসী প্রথম মাসে।
প্রসবিল রাজরাণী রাত্রি অবশেষে॥
ভরতের জন্ম (১৩।২৭ক)

কতকগুলি বার ও তিথি বিশেষ পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। সেইগুলিকেই কবিগণ

তাঁহাদের কাব্যের নায়ক নায়িকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন মনে হয়। কৃত্তিবাসের জন্মতিথিও এই ভাবেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীতে উল্লিখিত জন্মদিন লইয়া গবেষণা করিবার অবকাশ থাকে না। তাঁহার অসামান্য জনপ্রিয়তা তাঁহার জীবনকে রহস্যাবৃত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার 'অদ্ভুত পাঁচালি গীত' ও 'অদ্ভুত কবিত্ব' লোককে মুগ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে কল্পনার জাল বুনিতে উৎসাহিত করিয়াছে। একজন তাঁহার পিতার নাম দিয়াছেন বিদ্যানন্দ ওঝা—

কীর্তিবাসে বন্দম মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে নিত্য বৈসে দেবী সরস্বতী॥
কীর্তিবাসের পিতা বৈসে বিদ্যানন্দ ওঝা।
মান্যের ভিতরে মান্য সম্বন্ধে হএ আজা॥ (১৬০২।২ক)

আর একজন কৃত্তিবাসকে সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন এবং গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার রত্নলাভের উল্লেখ করিয়াছেন—

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের সকল গোচর।
নানা রত্ন দিয়া যাকে পূজিল গৌড়েশ্বর॥ (২৫৫।১৬৭ক)

তাঁহার অসাধারণ খ্যাতিই পুথিতে নিয়মিত ভাবে তাঁহাকে কীর্ত্তিবাসরূপে অভিহিত করিবার কারণ, না উহাই তাঁহার আসল নাম ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই।

উল্লিখিত পুথিগুলির কাহিনীগত এবং মধ্যে মধ্যে পাঠগত মিল লক্ষণীয়। হুবহু মিল না থাকিলেও কিছু কিছু মিল এখানে ওখানে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাহা হইতে একটা মূল পাঠ গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নয়। তথাপি ইহাদের তুলনামূলক আলোচনার ফলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে প্রচলিত গ্রন্থের একটি রূপের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাইবে। পুথিগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, অন্ততঃ দুই শত সওয়া দুই শত বৎসর পূর্বে এই রূপটি বাংলার অংশবিশেষে প্রচলিত ছিল। পুথিগুলির বেশির ভাগই বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত। কয়েকখানিতে নকলের তারিখ পাওয়া যায়। তারিখগুলি মল্লাব্দ অনুসারে দেওয়া হইয়া থাকিতে পারে। ২৫৫ পুথির দুই রকম তারিখ মিলাইলে প্রথমটি মল্লাব্দের স্পষ্ট বুঝা যায়।

৪নং পুথিখানির তারিখ	১১৬৪ সাল ২৬শে আষাঢ়।
১৭নং পুথির তারিখ	১২৪০ সাল ১৩ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।
২৫৫নং পুথির তারিখ	১০৫৪ সাল, ১৬৭১ শকাব্দ।
৩৮৫১নং পুথির তারিখ	১০৮২ সাল ৬ ফাল্গুন রোজ সোমবার তিথি সপ্তমী।

১৩নং পুথিখানি ১-১৪০ পত্রে সম্পূর্ণ; ৪নং পুথি মাঝে মাঝে খণ্ডিত হইলেও প্রায় সম্পূর্ণ; ১৭নং পুথি আপাতদৃষ্টিতে ১ হইতে ১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইলেও ইহাতে প্রারম্ভের কিছু অংশ নাই—ভগীরথের গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ হইতে ইহার সূচনা; ২৫৫ সংখ্যক পুথিখানি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ। তবে ইহার গোড়ার অর্ধাংশের বেশি ও মাঝে মাঝে কিছু কিছু অংশ নাই। আদ্যন্তহীন ৩নং পুথির সঙ্গে ১৩নং পুথির মাঝে মাঝে মিল

দেখা যায়। ৩৮৫১ ও ৪৮৩১ পুথিতে এই বিস্তৃত কাহিনীর সামান্য অংশ মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। প্রথমখানিতে মারীচের পলায়নের পর রামের বিবাহের প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত আছে— দ্বিতীয়খানিতে রামসীতার বিবাহ প্রসঙ্গ ও রামের বাসর বর্ণনা মাত্র আছে।

ইহাদের মধ্যে কোন কোন পুথিতে কেবল কৃত্তিবাসের ভণিতা পাওয়া যায়— কোথাও বা অন্য কবির ভণিতাও মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনন্তদাস (২৫৫।২৩১খ, ৪।৭৯খ, ৮০খ), লক্ষ্মণদাস (২৫৫।২৩৬খ), দ্বিজ মধুকণ্ঠ[১] (২৫৫।২৩৮ক, ২৩৯ক, ২৪০ক, ২৪১খ, ৪৮৩১।৫ক, ৬খ, ৪১ক, ৪১খ, ৪৩ক, ৪৩খ, ৪৫খ), বাণীকণ্ঠ (৪৮৩১।৭৬খ, ২৭ক, ১৪ক) ও যাদব (১৩।১১৭খ)।

এক্ষণে পুথিগুলির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উহাদের তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে। ১৩নং পুথিখানির বিষয়বস্তুর উল্লেখ করিয়া অন্যান্য পুথির সঙ্গে ইহার মিল ও অমিলের বিবরণ দেওয়া হইবে। পুথিগুলির বেশির ভাগই পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় আলোচনার অসুবিধা পদে পদে অনুভূত হয়।

১৩ সংখ্যক পুথির প্রারম্ভে রামরূপে বিরাজিত নারায়ণের বর্ণনা— লক্ষ্মণ প্রভৃতি তাঁহার সেবারত— দেবগণ তথায় উপস্থিত। রামকথার জগতে প্রচার নাই দেখিয়া ব্রহ্মা চিন্তিত— চ্যবনপুত্রের দ্বারা ইহার প্রচার হইবে, নারদের এই আশ্বাস দান।[২] অতঃপর রত্নাকরের কাহিনী। শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্বন্ধে বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে নারদ কর্তৃক চন্দ্রবংশের ইতিহাসবর্ণন (১০খ-১২ক)। শ্বেত রাজা কর্তৃক নিজ মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ (১১খ)। সূর্যবংশের ইতিহাস বর্ণনপ্রসঙ্গে রামের কাহিনী (১২ক-খ)। সৃষ্টিবর্ণন (১৪ক-খ)। মরীচ রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যবংশের বিবরণ[৩] (১৬ক)। পিতার উদর ভেদ করিয়া মান্ধাতার জন্ম (১৭খ), লবণের সহিত যুদ্ধে মান্ধাতার পরাজয় ও মৃত্যু (১০খ)[৪] মুচকুন্দ কর্তৃক

---

১ মধুকণ্ঠ কৃত্তিবাসকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

সময়ে সকল ফলে দ্বিজ মধুকণ্ঠ বলে বন্দিআ পণ্ডিত কীর্তিবাস (৪৮৩১।৪৫খ, ২৫৫।২৪১খ)।

২. ৪ সংখ্যক পুথির প্রারম্ভে শান্তার বিবাহের কথা। বিবাহপ্রসঙ্গের পরে রামনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা কর্তৃক সরস্বতীকে পৃথিবীতে প্রেরণ ও রামভক্তের কণ্ঠে অবস্থানপূর্বক রামনাম প্রচারের অনুরোধ। সরস্বতীর বরে রামচিন্তাপরায়ণ বাল্মীকির কবিত্বলাভ— নারদ কর্তৃক রামবৃত্তান্ত কথন (৪খ-৫খ)। ব্যাধ কর্তৃক পক্ষীর নিধন দর্শনের শোকে বাল্মীকির মুখ হইতে শ্লোকের উৎপত্তি ও ব্রহ্মার বরে তাহার সাহায্যে রামায়ণ রচনা (৬খ)।

৩. ৪নং পুথিতে (৬খ-৮খ) সূর্যবংশের রাজধানী অযোধ্যার গৌরববর্ণনা ও বংশের রাজগণের নাম উল্লেখমাত্র আছে— নামগুলি অনেক ক্ষেত্রে অভিনব বলিয়া মনে হয়।

৪. ৩ সংখ্যক পুথির ২৬ক পত্র।

পিতার শ্রাদ্ধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান (২১খ), পৃথুরাজার বিবরণ (২৩খ), ইক্ষ্বাকুর বিবরণ (২৪ক)[১], ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাকুৎস্থের তারকদৈত্যবধ (২৬ক)[২], দণ্ড ও শুক্রকন্যা অজার কাহিনী (২৮খ), হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী (৩০ক)[৩], রুইদাসের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাহিনী, বশিষ্ঠের শাপে মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাঘ্ররূপ ধারণ (৩৭খ), কল্মাষপাদ নামের তাৎপয (৩৭খ)[৪], রুক্মাঙ্গদের একাদশী (৪৬খ), মরুত রাজার রাবণের বশ্যতা স্বীকার (৪৭খ)[৫], রাবণের সহিত যুদ্ধে অনারণ্য রাজার পতন (৫০ক)[৬], সগরের অশ্বমেধ (৫৬খ)[৭], ভগীরথের জন্ম (৫৭খ)[৮], ভগীরথের গঙ্গানয়ন (৬৬খ-৬৭ক)[৯], ধ্রুবচরিত্র (৬৯খ)[১০], দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও রঘুর অভিষেক (৭৩ক)[১১], বরতন্তুশিষ্যকে রঘুর চৌদ্দ কোটি সুবর্ণ দান ও রাবণ কর্তৃক উহা অপহরণ (৭৫ক)[১২], দশরথের শনিসকাশে গমন ও রাজ্যের অনাবৃষ্টি দূরীকরণের ব্যবস্থা (৮৭খ)[১৩], দশরথ কর্তৃক দেবশত্রু দিতি নামক অসুর বধ (৮১ক)[১৪], কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট আহত দশরথ কর্তৃক কৈকেয়ীকে বরদানের

১ ইক্ষুবনে হৈল নাম থুইল ইক্ষ্বাকু—১৩।২৪ক, ইক্ষুবনে প্রসবিলা নাম থুইল ইক্ষ্বাকু—৩।৩০খ।

২. ৩।৩২ক।

৩. ৩।৩৬ক। 'হরিশ্চন্দ্র যুবরাজ হরিবিজয় রাজা। রাজকর নাই রাজ্যে সুখে বৈসে প্রজা॥'—সামান্য পাঠান্তর সহ দুই পুথিতেই এইরূপ বর্ণনা আছে। অন্য কোন কোন রাজার বর্ণনায়ও এইরূপ কথা পাওয়া যায়।

৪. দুই পাদ পুড়িল তার শাপের জলে। কল্মাষপাদ বলি তার খ্যাতি মহীতলে॥ ৩নং পুথিতেও অনুরূপ পাঠ আছে। ১৩নং পুথি অনুসারে তণ্ডব নৃপতির পুত্র যযাতি (৩৮খ), তৎপুত্র পুরু, তৎপুত্র মহাশঙ্খ, তৎপুত্র ত্রিশঙ্খ (৪৩খ)। ৩নং পুথিতে যযাতির কথা নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের পরে মহাশঙ্খ, তৎপরে ত্রিশঙ্খ (৪৭খ)—ত্রিশঙ্খের পুত্র রুক্মাঙ্গদ (৪৮ক)।

৫. মরুতরাজার যজ্ঞ—৩।৫৪খ।

৬ ৩।৫৭ক।

৭. সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জের বনবাস—৩।৫৯ক।

৮ ৩।৬৭ক।

৯. নদীয়া ফুলিয়া সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর মধ্য দিয়া গঙ্গাকে নিয়া যাওয়া হয়। নবদ্বীপ শান্তিপুরের উল্লেখ নাই।

১০. উত্তানপাদের দুই স্ত্রীর নাম এই পুথির মতে বাসবাবতী ও জ্ঞানাবতী।

১১. ১৭।১৭খ।

১২. ১৭।২২খ। ১৭নং পুথির মতে অজের স্ত্রী 'ইন্দুমতী পরাণ তেজিল সর্পাঘাতে' (২৫ক)।

১৩ ১৭।৩০ক।

১৪. ৯১ক পৃষ্ঠায় পুনরায় এই প্রসঙ্গ দেখা যায়। তবে, পূর্বের অংশের সহিত ইহার ভাষার মিল নাই।

ইচ্ছা (৮১), দশরথ কর্তৃক সিন্ধুমুনি বধ (৮৮)[১], দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও পুত্রলাভ(৯৯)[২], দশরথের নখব্রণ ও কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদানের অভিপ্রায়[৩], রাম কর্তৃক মায়ারাক্ষস বধ (১০৪-৫)[৪], বীরবাহুরূপী ইন্দ্রের নিকট রাম প্রভৃতির অস্ত্রশিক্ষা (১০৭)[৫], মাঘী পূর্ণিমায় দশরথের সপুত্র গঙ্গাস্নান যাত্রা, গুহকের সহিত সংঘর্ষ ও পরে মিত্রতা (১০৮)[৬], মারীচের অত্যাচার হইতে যজ্ঞরক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে নিতে বিশ্বামিত্রের আগমন— দশরথের অনিচ্ছায় বিশ্বামিত্র কর্তৃক অযোধ্যানগর দাহ— রাম স্বয়ং যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় বিশ্বামিত্রের কোপশান্তি ও রামলক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রের অনুগমন (১১১)[৭], তাড়কা রাক্ষসী বধ (১১৪.)[৮], রামলক্ষ্মণের মন্ত্রদীক্ষা ও গঙ্গানদী পার হওয়া (১১৫)[৯],

---

১ ১৭।৩৫ক। ইহার পরে কৈকেয়ী কর্তৃক রাজার আঙুলের ব্যথার প্রতীকারের কথা বলা হইয়াছে (৩৬খ)।

২ পুত্রলাভার্থে দশরথের বিষ্ণুযজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ (১৭।৩৭ক)। ১৭নং পুথির মতে কৌশল্যার পুত্রজন্মের সংবাদ শ্রবণমাত্র কৈকেয়ী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মন্থরা তাঁহার পুত্রকে রাজা করাইবেন এই আশ্বাস দিলেন :

> মর্ম বুঝি মন্থরা কহিছে জোড় হাতে।
> এখনি তনয় হবে তোমার গর্ভেতে॥
> প্রকারেতে ছত্রদণ্ড ধরাইব তায়।
> মোর ঠাই আছে রাণি অনেক উপায়॥ (১৭।৪৫ক)

৪নং পুথিতে বর্ণিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সংবাদে বিষ্ণুর দশরথগৃহে জন্মের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইয়াছে (৪।৩৩খ)।

৩. ৩।১১২খ, ৭।৪১খ।

৪. অস্ত্র না শিখিয়া রাম মারিল নিশাচর—১০৬ক। বনমধ্যে রাম কর্তৃক পিঙ্গল রাক্ষস বধ (১৭।৫৩)।

৫. ৩।১১৫ ; ৪।৪৫-৬ ; ২৫৫।১৬৭। কালীপূজান্তে ইন্দ্র কর্তৃক রামলক্ষ্মণকে অস্ত্রদান (১৭।৪৮খ)।

৬. মহামহাবারুণী উপলক্ষ্যে দশরথের গঙ্গাস্নানে যাত্রা, বশিষ্ঠ কর্তৃক রামের নিকট গঙ্গার উৎপত্তিকাহিনীবর্ণনা, গুহকের সহিত দশরথ ও রামের যুদ্ধ— পরে মিত্রতা (১৭।৫৬-৫৮)।

৭. ২৫৫।১৭০-২ ; ৪।৪৯খ।

৮. ৪।৫২খ ; ২৫৫।১৭৫ক ; ১৭।৬৫খ। রামের সহিত তাড়কার যুদ্ধকালে 'বিশ্বামিত্র ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া' (১৭।৬৫খ)।

৯. ৪।৬৭।

অহল্যা-উদ্ধার[১], দিতির আশ্রম দর্শন (১১৮)[২], শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের গুণবর্ণনা (১২২)[৩], মারীচের ভঙ্গ (১২১)[৪], রামের বিবাহ প্রস্তাব ও হরধনুর কাহিনী (১২৫)[৫], রামের ধনুর্ভঙ্গ (১২৭)[৬],

---

১. ২৫৫।১৮০, ৪।৬৯, ৩।১২৩, ১৭।৬৯।

এত বলি লক্ষ্মণ চরণের রেণু লইয়া। অহল্যার সর্বাঙ্গে দিলেন মাখাইয়া॥
অহল্যা পাইল যেই রামের পদরেণু। সর্বাঙ্গ সহিত হৈলা লোমাঞ্চিত তনু॥
(১৭।৬৯খ)।

৪নং পুথিতে এই প্রসঙ্গে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গানয়ন ও গঙ্গার ফুলিয়া, সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী হইয়া সমুদ্রে পতনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে (৫২-৬৭)। গঙ্গা পার হইয়া নাবিককে আশীর্বাদ করার কথা আছে (৬৭খ)। ৩নং পুথিতে অহল্যা-উদ্ধারের পরে গঙ্গানয়ন কাহিনী ও গঙ্গা পার হওয়ার কথা আছে—পাটনির কথা নাই (১২৪)। ১৭নং পুথির মতে উদ্ধারের পরে অহল্যা রামের নিকট স্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করেন—ইন্দ্রকে শাপদানের বৃত্তান্ত গৌতম নিজে বর্ণনা করেন (৭০-৭২)—রামের কৃপায় গঙ্গার মাঝির নৌকার স্বর্ণত্বপ্রাপ্তি ঘটে (৭৫)।

২. ২৫৫।১৮২, ৪।৭০।

নর্মদা নদীর তরে দেখে দিব্যজল।
নানা পুষ্প গন্ধে ভ্রমর করে কোলাহল॥
• • •
আজি রাত্র বঞ্চিব আমি বৈশালিক দেশে।
কালি প্রাতে করিব রাম মিথিলা প্রবেশে॥ (৪।৭০-৭১)

১৩নং পুথির বর্ণনাও অনুরূপ (১১৮ক পত্র দ্রষ্টব্য)।

৩. ৪।৭১খ-৭৪ক। ২৫৫।১৮৩ক-১৮৭খ।

৪. ৪।৭৬; ৩।১২৬।

৫. ২৫৫।১৯৪; ৪।৭৯।

৬. ৩।১৩০। ৪ ও ১৭নং পুথিতে রামদর্শনে সীতার ব্যাকুলতা বর্ণিত হইয়াছে (৪।৮০, ১৭।৮০)। ১৭নং পুথিতে এই প্রসঙ্গে কিছু লঘুভাবের অবতারণা করা হইয়াছে :

বিশ্বামিত্র চাহিলেন শ্রীরামের পানে।
ধনু ভাঙ্গ রাঘব বিলম্ব কর কেনে॥
ঝরকার পথে দৃষ্টি কর নারায়ণ।
দেখ রাম ধনু ভাঙ্গি পাইবে কি ধন॥
এতেক শুনিয়ে রাম ঈষদ নয়ানে।
চাহিলা জানকীনাথ জানকীর পানে॥
জানকীর নেত্রে রামের লাগিল নয়ন।
কৃতাঞ্জলি জানকী দাণ্ডান ততক্ষণ॥